অ্যান্থনী মাসকারেণহাস

প্রণীত

দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ

দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ

অ্যান্থনী মাসকারেণহাস

অনূদিত ঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি)

PP পপুলার পাবলিশার্স
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পপুলার পাবলিশার্স
২০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৭১১৫৯২১

প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুন, ১৯৮৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১১

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

বর্ণবিন্যাস
কসমোপল কম্পিউটার
৮ হাটখোলা রোড (২য় তলা), ঢাকা

মুদ্রণে
ডট প্রিন্টার্স
১০, শুকলাল দাস লেন, কাগজীটোলা
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬১১৪১-৩
ফ্যাক্স : (৮৮ ০২) ৯৬৬২৮৪৪, ৮৬১০৭৭৪
E-mail : aahcl@bangla.net

মূল্যঃ ১৭০.০০ টাকা

The Rape of Bangladesh. (A Bengali translation of Anthony Mascarenhas's The Rape of Bangladesh) by R. N. Trivedi (Ranatri). Former PRO, Government of Bangladesh, Mujibnagar. Published by Md. Serajul Islam, **Popalar Publishers**, 20 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100. First Edition : June 1989, 6th Prient : August 2011.

Price Tk. 170.00

ISBN : 984-8548-06-9

দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ
THE RAPE OF BANGLADESH

জনৈক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে
শুভেচ্ছান্তে
ভবদীয়
টনী মাসকারেণহাস
লন্ডন, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

To : A Gallant F. F.
With all good wishes
Sincerely
Tony Mascarenhas
London. 17-9-85

বক্তব্য

অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের গ্রন্থ 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এ অমূল্য গ্রন্থটি দিয়েই লেখক বিশ্ব বিবেকের কাছে সত্য ও মানবতার জয়গান, সে সঙ্গে পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণ, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাসকে মূর্ত করে রেখেছেন।

এই গ্রন্থে উত্থাপিত অনেক তথ্যের সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবুও সে সময়ের মাপকাঠিতে তাঁর সাহসিকতা ও অকপট প্রতিবেদনের জন্য প্রতিটি বাঙ্গালী হৃদয়ে তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

বইটি অক্টোবর ১৯৭১-এ প্রকাশিত হয় এবং বইটির শেষ পংক্তিতে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, "আমরা সবেমাত্র একটি নতুন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্যের শুরু, সেখানে পৌঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে।" সময় লেগেছে ঠিকই। মাত্র দেড় মাস পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনেন। ইতিহাস রোমন্থনে স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায় জানার সুযোগ এনে দেবে ভেবে সহজ ও সরল বাংলায় 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' পাঠকদের হাতে অর্পণ করলাম। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে বইটির তৃতীয় সংস্করণ এবং ভাষা ও শহীদ দিবসে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

ধন্যবাদান্তে
রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি)

মুখবন্ধ

১৪ই এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে পাকিস্তানী ক'জন সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীসহ আমিও ঢাকায় গিয়েছিলাম। পূর্ব-বাংলা 'স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করা ছিল আমাদের কাজ বা এ্যাসাইনমেন্ট।' ঢাকার রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিশাল এলাকা জুড়ে আগুনে পোড়ানোর চিহ্ন, দোকানপাট বন্ধ, গোলার গর্তের চিহ্ন, বুলেটের দাগ, ঘন কালো ধুঁয়ার কুন্ডলী তখনও উপরে উঠছে, বাতাস ভারাক্রান্ত। যাহোক, এসবই ধ্বংসের ঘটনা আপনা-আপনিই কথা বলছে, যে ঢাকা নগরীকে সজীব ও বন্ধু-বাৎসল্যের জন্যে এতদিন জেনে এসেছি এবং ভালবেসেছিলাম, সে ঢাকা যেন আজ করুণ হাস্যকর অনুকরণের নগরী। আমার অনেক বন্ধুকে আমি খুঁজে পেলাম না। কেউ চিরকালের মত হারিয়ে গেছেন। অন্যেরা, আমাকে যা বলা হয়েছে 'পালিয়ে গেছেন।' অনেক বিপদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে একজনকে পেলাম। তিনি নিরাবেগ কণ্ঠে বললেন, 'কেন এসেছেন?' আমি বিড়বিড় করে একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছিলাম, তিনি মন্তব্য সংক্ষিপ্ত করে বললেন, 'যে পাকিস্তানকে আপনি ও আমি জেনেছি তার কোন অস্তিত্ব নেই। সেভাবেই আমাদের মেনে নেয়া ভাল।' তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তার পরের দশ দিন ষোলতম পাকিস্তান আর্মি ডিভিশনের সদর দফতর কুমিল্লায় এবং পূর্ব-বাংলার অন্যান্য স্থানে সফর করেছি। তখন আমি অস্বস্তিকর অবস্থায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যা সংগঠনের গা কাঁপানো রূপ দেখেছি। যদিও আমার সহকর্মীরা পরবর্তীকালে অস্বীকার করেছেন, তবু আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলতে পারি, আমরা যা দেখেছি তাতে আমরা সকলেই শিউরে উঠেছিলাম। আমিই শুধু এটা মেনে নিতে পারিনি। পূর্ব-বাংলায় আমি যা দেখেছি, হিটলার বা নাৎসীদের অমানবিক অত্যাচারের কথা যা পড়েছি, তার চেয়েও ভয়াবহ মনে হয়েছে, আর সেই অত্যাচার আমার দেশের লোকের উপরে ঘটছে। আমি জানতাম, পূর্ব-বাংলার এ দুর্বিষহ যন্ত্রণার কথা আমাকে বিশ্ববাসীর কাছে বলতেই হবে। তা'না হলে সারা জীবন এ মানসিক যন্ত্রণার বোঝা অপরাধীর মত আমাকে বইতে হবে।

এই দৃঢ় চেতনা নিয়ে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লন্ডনে পৌঁছলাম এবং 'সানডে টাইমসের' কাছে এ খবর জমা দিলাম। এতে আমার কিছু ভয় বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি, তা নয়। বহু বছর সাংবাদিকতা করেও আমি জানতাম না যে আমার মত একজন বহিরাগত, বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফ্লিট-স্ট্রীটের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। 'সানডে টাইমস'-এ তা'হল না। টমসন হাউজে প্রথম প্রবেশের চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা আমার কথা শুনলেন, গ্রহণ করলেন। আমি পাকিস্তানে ফিরে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আসার জন্যে তৈরি হলাম।

একটি বিরাট সংবাদপত্রের মহান সম্পাদক হ্যারল্ড ইভানস্ এবং 'সানডে টাইমস'- এর বৈদেশিক বিভাগের অন্যান্য সাংবাদিক যেমন- ফ্রাঙ্কগিলম, নিকোলাস ক্যারল, ডোনাল্ড ম্যাককরমিক এবং গডফ্রে ইজসেনের সাংবাদিকসুলভ অনুভূতি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণার কথা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। ১৩ই জুন ১৯৭১ তারিখে 'সানডে টাইমস' পাকিস্তানের গণহত্যার সকল ঘটনা প্রকাশের পর বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে।

এই বইটি, ঐ প্রতিবেদনেরই যুক্তিসঙ্গত অনুসিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের নাটকীয় ঘটনা বলতে গিয়ে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল নৃশংসতার বিশদ আলোচনা করিনি। কতিপয় ভুল ধারণা সংশোধনের জন্যে সেগুলো উত্থাপন করেছি, কেননা সেগুলো সকলের কাছেই সুবিদিত। আমি আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ এবং ঐ অঞ্চলে তাদের স্বার্থের কথা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করিনি, কারণ ব্যক্তিগতভাবে ঐ এলাকা সফরের পরেই তা করতে চাই। আমি যা'করতে সচেষ্ট হয়েছি তা'হল এ ভয়াবহ ঘটনাগুলোর যে রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা এবং আমাদের প্রজন্মের সম্ভবতঃ মানবজাতির সবচে' বিয়োগান্ত ঘটনার প্রধান চরিত্রগুলোর অভিসন্ধির ব্যাখ্যা দেয়া। আমি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই করেছি।

আমি এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানি, কেননা আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়টা এঁদের সঙ্গেই কাটিয়েছি। এসবের জন্যে তাঁদের কাছ থেকে আমাকে অনেক নিন্দা ও দুর্নাম সইতে হয়েছে। যাঁরা আমার কাছে একদিন খুব কাছের মানুষ ছিলেন এবং করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডিতে আমি যাঁদের কাছে পরিচিত ছিলাম, তাঁদের সকলেই আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে ও বিশ্রী গালি দিয়েছে।

আমি আমার শেষ বিচারের ভার ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমি যা করেছি যতটুকুই আমার দ্বারা করা সম্ভব ছিল।

পরিশেষে, আমি ব্যক্তিগতভাবে গডফ্রে ইজসন এবং আলম্যায়রের ডি'স্যুজাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা তাঁদের নিজেদের অনুকরণীয় পদ্ধতি দেখিয়ে আমার নতুন পরিবেশের জীবনকে সহনীয় করতে সহায়তা করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাই আমার স্ত্রী য়ুভন ও বাচ্চাদের যারা দুর্দিনে আমার সঙ্গে থেকে সব মানিয়ে নিয়েছে।

লন্ডন, ১ অক্টোবর ১৯৭১ — অ্যান্থনী মাসকারেণহাস

প্রকাশকের বক্তব্য

১৯৮৫ সালে বিলেতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে থাকাকালীন সময়ে অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা সব গ্রন্থগুলোর বিপণন ও বিতরণের জন্য বাংলাদেশে আমার সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হন, এবং বঙ্গানুবাদ, বিপণন ও বিতরণের একক দায়িত্ব আমাকে প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর এ 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইতিহাস রোমন্থনে স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায় জানার সুযোগ এনে দেবে ভেবে সহজ ও সরল বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি) অনূদিত 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

ঢাকা
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

সিরাজুল ইসলাম

অনুবাদক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (জন্ম-মাতুলালয়, মালদা ১০মার্চ ১৯৪৪, পৈত্রিক নিবাস-তালমা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ) মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১এপ্রিল মাসে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় একজন সংগঠক-মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার-এর বেসামরিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার একজন কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধকালে সাহায্য, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান মহোদয়ের জনসংযোগ ও শরণার্থী বিষয়ক কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুল, রাজেন্দ্র কলেজ ও মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেন। বিসিএস : তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অতিরিক্ত প্রেস সচিব (যুগ্ম সচিব, ১৯৯৭-১৯৯৮) ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রেস সচিব (অতিরিক্ত সচিব, ১৯৯৯-২০০১) পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তাঁর বিরচিত বহুল আলোচিত গ্রন্থগুলো : কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ কালীন দৈনন্দিন ইতিহাস একাত্তরের দশমাস (১৯৯০), দি রেইপ অব বাংলাদেশ (অনুবাদ) ১৯৮৯, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা: বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, (১৯৯৬), সুখের সন্ধানে বার্ট্রান্ড রাসেল (অনুবাদ, ১৯৯৭) জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ।

কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অন্যতম দালিলিক গ্রন্থ "বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায়" (কাকলী প্রকাশনী, ২০১০)। তাঁর পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ "Murder, Mayhem and Politics in Bangladesh" Kakoli Prokashani (2010)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন পাঠ্যক্রমে এটি স্বীকৃত রেফারনস গ্রন্থ।

মিঃ ত্রিবেদীর আলোচিত হাক্কানী পাবলিশার্সস থেকে প্রকাশিত দালিলিক গ্রন্থ "International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman : Documents 1971-1975, Vol-I & Vol-II, 1999, (UBSPD, New Delhi & Parama , Dhaka); ছয় দফা আন্দোলনের একমাত্র তথ্যবহুল গ্রন্থ 'ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ' (হাক্কানী, ১৯৯৭); 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র' (দুইখন্ড), ২০১২, হাক্কানী পাবলিশার্সস, ঢাকা। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ- ইতিহাস প্রসঙ্গ',২০১২, হাক্কানী পাবলিশার্সস, -ঢাকা। তিনি গবেষক, মুক্তিযুদ্ধের লেখক কলামিষ্ট ও মানবাধিকার সংগঠক হিসাবে দেশে ও বিদেশে পরিচিত।

সূচিপত্র

দুর্বিপাকের পূর্বরঙ্গ	১৫
হেতুর যৌক্তিকতা	২৭
দ্বন্দ্বের মূল হেতু	৩৩
আর্থনীতিক হেতু	৩৯
চরম বিশ্বাসঘাতকতা	৪৪
এক 'নব সূচনা'	৫১
নির্বাচন-পূর্ব টালবাহানা	৫৯
নির্বাচনোত্তর প্রহসন	৭৫
সামরিক বাহিনীর অভিযান	৯৪
অবিস্মরণীয় পঁচিশ দিন	১০১
গণহত্যা	১২০
গোয়েবলসের পুনরাবির্ভাব ...	১২৯
কেন আশি লাখ লোক মারা যাবে	১৪৫
পরিশিষ্ট ...	১৪৯

ছবি-শিরোণাম

১. বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২. "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" — জয় বাংলা।

— শেখ মুজিবুর রহমান (৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ)

৩. যে বিভীষিকা ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সে দেখেছে তা'তে স্মৃতির কুহরে তোলপাড় করা আতংক তাকে তাড়া করে ফিরছে— এই শরণার্থী সকলের কাছে প্রাণভিক্ষা করছে —ক্ষমা কর বিধাতা।

৪. মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি।

৫. নবজাত শিশু কোলে লুটেরার হাত থেকে পরিত্রাণের পর প্রথম নিরাপদ নিদ্রা।

৬. আগরতলা শরণার্থী শিবির ঃ 'খাদ্যের সন্ধানে ক্রন্দনরত বাস্তুহারা শিশু'

— সন্তান মোর মা'র।

৭. ইয়াহিয়ার শত্রুতার শিকারদের গণকবর।

— মহাকালের সাক্ষ্য

৮. পাকবাহিনী এ মহিলার স্বামীকে হত্যা করেছে। ক্রন্দনরত দেবর ও বিধবা।

— ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগরুক।

৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা।

১০. পাকবাহিনীর হত্যাকান্ডের দৃশ্যাবলী।

১১. পাক হানাদার বাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত দালান কোঠা।

১২. রাজাকার, আলবদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকান্ডের দৃশ্য।

১৩. ১৯৭১-এর গণহত্যা।

১৪. ইয়াহিয়ার ষাঁড়ের চোখ।

১৫. ৯ মাস যুদ্ধের সময় শাঁখারী বাজার এলাকার নিত্য দিনের দৃশ্য।

১৬. পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলা।

দুর্বিপাকের পূর্বরঙ্গ

২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার। বিকেল প্রায় পাঁচটা। ১৯৭১ সাল। ঢাকা বিমান বন্দরের রাস্তায় বাবলা ও অশ্বত্থ গাছের বিকেলের ছায়া দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। সে সময়েই নম্বরবিহীন কালো মার্সিডিস গাড়ী প্রেসিডেন্টের নিশান উড়িয়ে সেনাবাহিনীর গার্ডের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বরফিস্টাইলের ভিআইপি টারমিনাল ভবনের বিপরীতে শান শওকতসহ এসে দাঁড়াল।

বিশ গজ দূরে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইট, আকাশ পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই সাদা ও সবুজ বর্ণের বোয়িংটিতে পূর্ণ জ্বালানী নেয়া হয়েছে। যাত্রাপথ ছ'হাজার মাইল। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র বুক ধরে শ্রীলংকায় উত্তরণ করে, তারপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবেশ পথ করাচী। বাছাই করা বৈমানিক শক্ত হাতে বিমানের প্রবেশ পথে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের জন্য অনুগৃহীত এই অনুষ্ঠানে– সকলকেই অস্বাভাবিক বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। যে ক'জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন, তাঁদের গাম্ভীর্যে ছিল দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ। চারিদিকে দুশ্চিন্তার তড়িৎ-চাবুক ঝলসে উঠেছিল। মৌসুমী রুক্ষবাতাস ও গুমোট আবহাওয়া তাতে আরো তীব্র উত্তেজনায় প্রকাশ পেয়েছে। পাশে দাঁড়ানো এক অনুগৃহীত ঝাঁজালো কণ্ঠে বলেই উঠলো, 'এটাকে ছুরি চালিয়ে টুকরো টুকরো করতে পারেন।'

সেই ভয়াল দিনে ঢাকা বিমান বন্দরকে ইউরোপীয় মিত্রবাহিনীর একটি সুরক্ষিত আগুয়ান বিমান ঘাঁটির মতো দেখাচ্ছিল। পর্যটন বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা নগরী। কিন্তু জনতার দৃষ্টির বাইরে আজ বিমান ঘাঁটি। কোন বাঙ্গালীর মুখ দেখা যায়নি, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি সর্বত্র। সমস্ত বিমান বন্দরটি ওরা ছেয়ে রেখেছে। বিমান বন্দরের চারপাশের চত্বরে সামরিক সেন্ট্রিগুলো বন্দুকের নল উঁচিয়ে দর্শকদের হটিয়ে দিয়েছে। প্রান্তের পীচঢালা পথে ইতস্ততঃ বালির বস্তার আস্তানায় চোয়াল আঁটা জোয়ানগুলো যুদ্ধের পোশাকে মেশিনগান তাক করে রয়েছে। পিছনে বিমান বিধ্বংসী বাহিনীর কামানের ক্রুগুলো বিশেষ পেশাদারী ভংগীতে বসে রয়েছে।

মনে হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকগুলো যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। সেদিনের বিমান বন্দরে অনুপ্রবেশকারী ছিল না, শুধু বিকেলের পড়ন্ত বেলায় একমাত্র ঝাঁক ঝাঁক বাদামী ও সোনালী ডাঁশ মাছি অলসভাবে উড়তে দেখা গিয়েছিল।

বিমান বন্দরের উৎকণ্ঠাপূর্ণ আবহাওয়া, ক্রমান্বয়ে লাউঞ্জ থেকে হলঘরেও সংক্রমিত হয়ে গেল। ভবনের অভ্যন্তরে দু'হাজার নারী-পুরুষ, শিশু— যাদের বেশীর ভাগই ছিল মেমন সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্যরা পাঠান। আসন্ন বিপদের ভয়ে বাসায় পরা পোশাকেই পালাচ্ছে। অনেকেই অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছে এখানে। বিছানাপত্র ও মানবদেহের অবস্থিতিতে বেশ নোংরা হয়েছে বিমান বন্দর। একটা অস্বস্তিতে তারা রয়েছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আতংক ছাড়াও খাদ্য ও পানীয় জলের সরবরাহ ছিল অপ্রতুল।

প্রেসিডেন্টের আগমনের আগে হলের মধ্যে কান ঝাঁজালো হৈ চৈ চলছিল। হাত ভর্তি টাকা নিয়ে অসংযত বিমান অফিসারদের সঙ্গে দরকষাকষি, ঘুষ দিয়ে বিমানের আসনের পারমিট বাগানোর ব্যস্ততা নিয়ে লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। এখন উচ্চ কণ্ঠে ফিসফিস আওয়াজ। বিমানের বেশ ক'জন কর্মী জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীর সঙ্গে যোগ দিল। বাইরে তাকিয়ে দেখলেন— প্রেসিডেন্টের বিদায় যাত্রা। যাঁরা সেদিন প্রেসিডেন্টের বিদায় যাত্রা দেখেছেন তাঁরা সেই বিদায়ী-লগ্নকে কখনো ভুলবেন না। অন্য আর সবদিক থেকে এ লগ্নটি ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের মোড় ফেরার লগ্ন। দশ দিন আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছিলেন ফুরফুরে হালকা মেজাজ নিয়ে, এখন সেখানে গভীর হতাশা। মেজাজে মলিনতার কালো ছায়া, সে ছায়া সর্বত্র, সকলের মুখে সংক্রমিত হয়েছে।

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ আর অফিসারদের সময় নষ্ট করতে চাননি। তারা তো এখন যুদ্ধের ময়দানে। সত্যিকার অর্থে, সামরিক কায়দায় তিনি বিদায় অভিবাদন সংক্ষিপ্ত করলেন। তাছাড়া এক মাইল দূরে ইস্টার্ণ কমান্ড হেড্‌কোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে আট ঘন্টার দীর্ঘ বির্বতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আলোচনা শেষ করে এসেছেন। সেজন্য সামরিক শুভেচ্ছা বিনিময় হ'ল সীমিত ক'জনের সংগে। দু'জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্ণধারের সঙ্গে একটু ফিসফিস ; নীচু স্বরে কথা হল। ফ্যাশান দুরস্ত সামরিক সালাম বিনিময় হল। এবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বিমানের প্রবেশ পথে উঠলেন এবং নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

উড্ডীয়মান বিমানে পি আই এর আতিথেয়তার সুনাম রয়েছে। আর সেদিনের বিমানের আয়োজন ছিল অতুলনীয়। বিমানের দরজা বন্ধ হতে না হতেই একজন বিমানবালা বিমান উড়বার রীতি উপেক্ষা করে কচ্‌ ও সোডাসহ গ্লাস সাজিয়ে

জর্ডানে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের বিবৃতির কথা স্মরণ করছি। জর্ডানের সেনাবাহিনী এবং প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানি সামরিক ইউনিটের (বিমান বিধ্বংসী বাহিনী) ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত বললেন ঃ "আমি আপনাদের ওয়াদা দিচ্ছি পাকিস্তানি বাহিনী কোথাও মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি গুলি ছুঁড়বার দায়ে দোষী হবে না।" এ বিবৃতিটির উদ্ধৃতি ও প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছিল। এ বিবৃতি দু'বছর আগের। আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, বর্তমানে পূর্ব বাংলায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটছে সেগুলো গলাধঃকরণ করতে ঐ রাষ্ট্রদূতের কিনা মানসিক কসরত করতে হচ্ছে।

যখন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান আজাদ রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হলো, সেই জন্মলগ্ন থেকেই কোন্দলের মাধ্যমে পাকিস্তানের সরকার প্রতিষ্ঠা। সেকালের ব্রিটিশ শাসিত ভারত সাম্রাজ্যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির ঐতিহাসিক আন্দোলন, মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য আশংকা করেছিলেন, ওটা ভাবা অযৌক্তিকও ছিল না। উপমহাদেশ ভাগাভাগির উদ্দেশ্য সাধনে ঐ ভাবনা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু এ চেতনাই দুটি ভৌগোলিক স্বতন্ত্র আর্থ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচিত ও বেদনাঘন সীমানা রোয়েদাদ দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের সমাপ্তি হলো এবং পাকিস্তানের জন্ম হলো। শুধু এক হাজার মাইল দূরত্ব বিস্তৃত ভারতীয় ভূখণ্ডই নয়, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ভাষা ও চিন্তায় রয়েছে পার্থক্য, তাদের জীবনযাত্রা, আহার ও বেশ-ভূষায় নিজস্বতা আছে। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে। এমন কি তাদের খেলাধুলাও আলাদা মেজাজের। ফুটবল–যা লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে উৎসাহিত করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর কদর কম বরং ক্রিকেট ও হকির প্রাধান্য। যদিও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মেলামেশা হচ্ছে, তবু বিয়ে-সাদী হচ্ছে কম। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সরকার দু'অঞ্চলের মধ্যে আন্ত ঃদেশীয় বিয়ে শাদীর জন্য ক'বছর যাবত চেষ্টা চালিয়েছে। প্রতিটি বিয়েতে পাঁচ'শ টাকা যৌতুক দেয়া হয়েছে তবুও হাতে গোনা যে ক'টি বিয়ে হয়েছে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ ধরনের দু'একটি বিয়ে বর্তমানে যুদ্ধের কারণে তিক্ত ঘৃণা ও দুঃখজনক পরিসমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিকভাবেও দুটি অঞ্চল ভিন্ন তরঙ্গে বাঁধা। পশ্চিম পাকিস্তান নিজেকে মধ্য প্রাচ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। সেভাবেই সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে এবং ১৯৫৮ সালের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এ ধরনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ জনগণের অস্বস্তিকর রাজনৈতিক চাপকে বানচাল করার প্রধান কারণ হয়ে থাকবে। সঙ্গত কারণেই ঐসব দেশগুলো থেকে এ ধরনের হাস্যকর প্রস্তাবে কোনো সাড়া না পেয়ে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানের অংশ হলেও পূর্ব বাংলার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অনুশাসনের প্রতি কখনই উৎসাহিত হয়নি।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সান্নিধ্যের উষ্ণতার লক্ষণ দেখা যায় নি। দিল্লিতে আমার তিন বছর থাকাকালে আমি দেখেছি–পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভারতীয়দের সঙ্গে যতটা নৈকট্য ও আন্তরিক, তাদের দেশবাসীর সঙ্গে ততটা নয়। যদিও দুটি দেশের মধ্যে ভারতীয় রাজধানীতে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ, তাতে বিপরীত অবস্থা হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। ১৯৫৮ সালে ওয়াশিংটনে এবং ১৯৬৭ সালে বিলেতে একই রকম দেখেছি। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একই সামাজিক অবস্থা দেখতে পেয়েছি। অবসর সময়ে বাঙ্গালী কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে কিংবা বিদেশি সহকর্মী বন্ধুদের সান্নিধ্য বেশি অভিপ্রেত মনে করে। পাঞ্জাবী ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের চলার পথও ভিন্নতর। যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় তা মিশনের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে কিংবা দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক সৌজন্য মদের পার্টিতে (ককটেল পার্টি)। যখন একজন কূটনীতিবিদ এ ধরনের কৌতূহল উদ্দীপক বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন আড়ষ্টতাহীনভাবে একজন পাঞ্জাবী কর্মকর্তা উত্তর দিলেন ঃ "এতে আশ্চর্যের কি আছে, শত হলেও আমাদের জন্মসূত্র-ধারার উৎস ভিন্ন।"

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃতি জনগণকে কর্মঠ ও উগ্র করেছে-। কষ্টসহিষ্ণু পাবর্ত্য মানুষ ও উপজাতীয় কৃষকদের সবসময় বন্ধুর পরিবেশ জীবন ধারনের জন্য তৎপর থাকতে হয়। বাঙালির এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। ভদ্র ও মর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি, তারা সহজ জীবনযাপন ও ব-দ্বীপ এলাকার প্রাচুর্যে বসবাসে অভ্যস্ত। কুমিল্লায় নবম ডিভিশনের একজন পাঞ্জাবী সামরিক কর্মচারীর মন্তব্য আমার বেশ মনে আছে। হাত দিয়ে চারিদিকে কালো উর্বর মাটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "হায় আল্লাহ্ এ বিচিত্র এদেশ দিয়ে আমরা কি না করতে পারি।" ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, "কিন্তু আমার মনে হয় তাহলে আমরা বাঙালিদের মতো হয়ে যেতাম।"

ইসলাম অবশ্যি পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের সাধারণ যোগসূত্র। কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে–দু'অঞ্চলের পরস্পরের প্রতি সাধারণ ক্ষেত্রে ধর্ম খুব নগণ্য বন্ধন সৃষ্টি করেছে। ভারত ভাগাভাগির সময় এ ধরনের ঘৃণা ততটা ছিল না। কেননা তখন হিন্দুদের সঙ্গে আদর্শিক বিরোধ ছিল। যা তৎকালীন ভারতবর্ষে 'পাকিস্তান' মুসলিম ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। পাকিস্তানের নতুন মুসলিম জনমানস, এই বিরোধপূর্ণ সূত্রগুলো উপেক্ষা করে, স্বাধীনতার প্রাথমিক উত্তেজনা ক্ষীণ হতে থাকলে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের ভিন্ন ধারা বইতে শুরু করলো। অস্তিত্ব রক্ষা ও অগ্রগতির সংগত কারণেই উগ্র কলহপ্রবণ পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবহুল পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলো। পূর্ব বাংলা তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আধিপত্য প্রতিরোধ করতে শুরু করলো। এ পটভূমিতে আর্থনীতিক বিষয়গুলো এলো সামনে আর ধর্মের স্থান গেল পিছনে, বিরোধ তীব্র হতে লাগলো।

এই আর্থনীতিক বিকাশ ধারাকে ও পূর্ব বাংলাকে পদানত রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকেরা বারে বারে গত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ধর্মীয় গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছে। যখনি রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রকট সমস্যাগুলো উত্থাপিত

হয়েছে তখনি 'ইসলামীকরণে'র নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। এসব হলো ধর্মান্ধতার নতুন ফতুয়া। সবসময় পুরনো আদর্শের ঢোল পিটানো হয়েছে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্তানে জাতীয় আদর্শে রূপ নিয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে ইসলামকে মুক্ত করে তোলার জন্য, সে কারণে ভারতের সঙ্গে সহাবস্থান সৃষ্টির কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। ভারত এসময় ভয়ংকর হিন্দু আধিপত্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই উদ্দেশ্য ত্বরান্বিত করার জন্য কাশ্মীর সমস্যা পাকিস্তানের জন্মক্ষণ থেকেই সুলভ বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জনসম্মুখের একাধিক অনুষ্ঠানে আমাদের বলা হতো "কাশ্মিরের যুদ্ধ বিরতি সীমানারেখা থেকেই পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি উৎসারিত।" পাঞ্জাবী ও পাঠানদের কাছে এটা খুব সুখশ্রাব্য ছিল, কারণ ওদের অনেকেরই কাশ্মিরের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাঙালিদের কাছে অতটা উত্তেজনার কারণ ছিল না, যদিও বাঙালিদের অনেকে দেশপ্রেমের কারণে সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন। কিন্তু সেটা ছিল খুবই সীমিত। শুরুতে কাশ্মীর নিয়ে যে প্রেষণাই থাকুক না কেন পরবর্তী সময়ে তা শুধু জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি পাকিস্তানী জনৈক কূটনীতিককে বলেছিলেন, "মান্যবর জনাব, আমার মনে হয় কাশ্মীর নিয়ে আপনাদের যতটা উদ্বেগ তার চেয়ে বেশি আগ্রহ কাশ্মীর সমস্যার প্রতি।" পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হলো তখন থেকেই ধর্ম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য প্রকাশের সাহায্য করেছে। কিন্তু দুই অংশের মানুষের মধ্যে প্রেম বা ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশে ও একসঙ্গে থাকার যথেষ্ট অবদান রাখেনি। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, "আর্থনীতিক অগ্রগতির প্রাধান্য এত বেশি যে, ইসলামের সৌহার্দ্য ও ঐতিহ্যের শ্লোগান দিয়ে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। এটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, পূর্ব বাংলার মানুষেরা আর্থনীতিক শোষণ ও তজ্জনিত অবনতি ভুলে গিয়ে ইসলামী বন্ধন শক্তিশালী বিবেচনা করেন।" শেখ মুজিবুর রহমানের আর্থনীতিক উপদেষ্টা এবং সমাগত নতুন বাংলাদেশ সংস্থাপনায় সবচেয়ে কৃতি অর্থনীতিবিদ রেহেমান সোবাহান এ বিষয়ে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন, "ব্রিটিশ ভারতের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের পোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্যই বাংলাদেশ ধর্মীয় ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশীদারী হয়েছিল। কেউ অমন ভাবেননি যে, এই ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হয়ে পাকিস্তানের শোষণ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে" (বাংলাদেশ আর্থনীতিক পটভূমি ও সম্ভাবনা)।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল যতই পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে ততই উভয়ের মধ্যে ইসলামের সাধারণ বন্ধন ম্রিয়মাণ হতে থাকে। পাঞ্জাবের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ নবাব মুস্তাক আহমেদ গুরমানীকে যখন এক পর্যায়ে অনুযোগ করতে শোনা গিয়েছিল, "শুধু দুটো পাখাই দেখা যাচ্ছে, পাখি দেখা যাচ্ছে না।" এখন এমনকি সেই ডানার ঝাপটানো পর্যন্ত নীরব হতে চলেছে।

পাকিস্তানে সংঘর্ষের মূল কারণগুলো

'১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও বাঙালিদের বুঝতে ২৪ বছর লেগেছে যে তারা স্বাধীন হয়নি।'

–কবীর উদ্দিন আহমেদ
(বাংলাদেশের জন্ম)

'আমার মতে বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিক্ষুব্ধ হওয়ার ন্যায়সঙ্গত কারণ রয়েছে।'

–প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান
জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ
জুলাই, ২৮, ১৯৬৯।

করাচিতে আমার ক'জন পুরানো বন্ধু অতীতের ঘটনা মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্তে আসলেন, মুসলিম লীগ যদি তার মুখ্য রাজনীতির দাবি ও ধারণা মেনে চলতেন তা'হলে যে সব দুঃখজনক ঘটনা দেশের ঐক্যসূত্র ছিন্ন করেছে তা হয়তো ঘটতো না। 'ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। ভারত উপমহাদেশের প্রান্তে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র একই নেতৃত্বে গঠিত হবে। ১৯৪০ সালে 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব' একজন বাঙালিনেতা উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের শেরে-ই-বাংলা ফজলুল হক নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, "ভারতের যে সমস্ত অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন ভারতের উত্তর পশ্চিমে ও পূর্বাঞ্চলে, এইসব অংশকে একত্র করে স্বাধীন রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সেই সব অংশকে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হতে হবে।"

ভৌগোলিক অবস্থা মোকাবেলার জন্যই এ প্রস্তাবনা এক ধরনের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আয়োজন ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণির সদস্যদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা পূরণে তা মনঃপূত হয়নি। 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব'এর ছ'বছর পরে রাষ্ট্রের দ্বিবচন শব্দটি কারণীকের ত্রুটি হিসেবে অবজ্ঞা করে একবচনে সুবিধাজনক ভাবে সংশোধন করা হয়। (৯ এপ্রিল ১৯৪৬, দিল্লি কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের 'States' শব্দটি 'State' হয়ে যায়। বাংলা তথা পূর্ব বাংলার পরাধীনতার সনদ রচিত হয় এই দিল্লি কনভেনশনে।–অনুবাদক)। এ থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা হলো। মুসলিম লীগ ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁদের ইতিহাসের জটিল সংকটের সরলিকরণে বিরক্তি বোধ করবেন। কিন্তু এটা বাস্তব বিবর্জিত নয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ সত্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তান রাষ্ট্রের দ্বিবচন রূপটির বজায় রাখার মধ্যে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাঁরা স্বীকার করেছেন, এ রাষ্ট্র দু'টির ঢিলেঢালা ফেডারেল ধারণার মধ্যে পাকিস্তানের

পরিচয় রক্ষার একমাত্র উপায়। এটাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির সারকথা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের মনোভাব ছিল না। পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অসম বৈশিষ্ট্যসমূহ ও এক হাজার মাইল ভারত ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি অংশকে সংযুক্ত রাখার সাংবিধানিক ও আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থায় ফন্দি আঁটা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমঅংশীদারিত্ব প্রধান উপাদান হিসেবে দু'অংশের ঐক্য বজায় রাখতে পারতো। কিন্তু শুরু থেকেই পরস্পর অংশীদারিত্ব ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের উৎকট গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বাদেশিকতা এটা গ্রহণ করেনি। তাই দেশের ঐক্য বজায় রাখার সকল প্রয়াসই বহির্মুখী উদ্দেশ্য সাধন করেছে,অনৈক্যেও পথকে প্রশস্ত করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর বাঙালিরা ৪টি মূল দাবিতে গণঅসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে তাদের অস্বীকার করা; মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বহু বছরের অস্বীকৃতি; পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে বাঙালিদের করুণার দৃষ্টিতে দেখা এবং আর্থনীতিক বৈষম্য যা ছিল, গলা টিপে ধরার শামিল। এ আর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে পরে আলোচনা করবো।

বর্তমানে প্রথম তিনটি কারণের বিষয়গুলো আলোচনা করছি।

অংশীদারিত্বহীনতা ঃ পাকিস্তানের প্রথম শাসতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়নে সাড়ে আট বছর লেগেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী বাঙালি নেতৃবৃন্দের সদস্য সংখ্যা কমানোর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। স্বীকার করতে হয় এ সবকিছু কতিপয় বাঙালি নেতৃবৃন্দের বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মুহাম্মদ আলী বগুড়ার সহায়তায় করা হয়েছিল। কিন্তু '১৯৫০ সনে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় দেখা যায়, এ সকল হতভাগ্য বাঙালি নেতৃবৃন্দ তাঁদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শক্তিশালী পাঞ্জাবীচক্রের হাতিয়ার হিসাবে বন্দি হয়ে পড়েছিল।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করেছিলেন। যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম-প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই সূত্র অনুযায়ী দুই অংশের দুইশত সদস্যবিশিষ্ট নিম্ন পরিষদ ও ষাট সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পরিষদ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার ৫৬ ভাগ জনসমষ্টির বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। এ বিষয়ে অকথিত কারণ ছিল,তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের দেড় কোটি হিন্দুর উপস্থিতি। যুক্তি দেখানো হয়েছিল সংখ্যালঘুদের বাদ দিলে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম জনবসতি পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে কম। লিয়াকত আলীর সূত্র পূর্ব বাংলায় কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর খান রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় আঁততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। যদিও নিহত হওয়ার সরকারি তদন্তের ব্যাখ্যা, পরিস্থিতির সঙ্গে সন্তোষজনক ছিল না।

১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হলেন। তিনি অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণ অতীতের ন্যায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন করেন। দু'বছর পরে পাঞ্জাবীচক্র যখন নাজিমউদ্দিনকে প্রয়োজন নেই ভাবলো তখন তাঁকে গদিচ্যুত করে। মুহাম্মদ আলীর বগুড়াকে নতুন প্রধানমন্ত্রী করে তৃতীয় সূত্র উত্থাপন করা হলো। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে মুহাম্মদ আলী বগুড়ার প্রস্তাবে নিম্ন পরিষদে পূর্ব বাংলার আকাঙ্খিত প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু উচ্চ পরিষদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল চরম হতাশাজনক। কেননা পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব উচ্চ পরিষদে ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হলে, অন্য দু'জনের মতো তাঁর আনীত প্রস্তাবটিও অনুরূপ ভাগ্যবরণ করে।

অবশেষে পাকিস্তানের দু'অংশে সম-প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। এ চুক্তিতে বলা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমসংখ্যক প্রতিনিধির এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইন পরিষদ থাকবে। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম-প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। যদিও এই সমতা ফর্মূলা ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু তাতেও বাঙালিদের উদারতার মূল্য দেয়া হয়নি। প্রশাসনে উচ্চতর পদে বাঙালিদের সংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ ওপরে অতিক্রম করেনি। এমনকি ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উনিশ জন সচিব পদে মাত্র তিনজন বাঙালি সুযোগ পেয়েছিলেন। সামরিক বিভাগেও বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে একজন মাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন। পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে বাঙালিরা সমমর্যাদার পদ পায়নি।

এই অসম প্রতিনিধিত্ব অতটা মারাত্মক হতো না যদি না লিয়াকত আলী খান আঁততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর থেকে পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রিত আমলা সামরিকচক্র দ্বারা পাকিস্তান শাসিত না হতো। সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মীরা এ বিষয়ে বহুবার উল্লেখ করেছেন। লোক দেখানো গণতন্ত্রের অন্তরালে অধিষ্ঠিত কয়েকজন বেসামরিক আমলাচক্র, সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সরকারি কর্মচারী থেকে রূপান্তরিত রাজনীতিবিদ এবং অবশেষে ক্ষমতালোভী সামরিক কর্মচারী নিজেরাই গত দুই দশক ধরে পাকিস্তানের নীতি র্নিধারণের সকল ক্ষমতা ভোগ করে আসছে।

নয়া দিল্লির জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান' স্টাডিস বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর মুহাম্মদ আইয়ুব, কার্নিভোন ভরিস-এর একটি স্টাডি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ১৯৪৮-৫৮ সাল পর্যন্ত যখন দেশে লোক দেখানো একটি সংসদীয় সরকার ছিল তখনও জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসেছে মাত্র ৩৩৮ দিন অর্থাৎ গড়ে বছরের ত্রিশ দিন। উক্ত সময়ের মধ্যে আইন পরিষদ মাত্র ১৬০টি আইন প্রণয়ন করেছেন। অন্যপক্ষে গভর্নর জেনারেল। প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ মূলে মোট ৩৭৬টি আইন জারি করেন।

এই সমস্ত ঘটনাই বাঙালিদের অসন্তোষের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। এটা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কৃতিত্ব বলা চলে যে তিনি প্রথম অবস্থায় এ ধরনের ক্রটিগুলো

সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বাঙালি জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সমতা ফর্মূলা বাতিল ঘোষণা করেন। প্রশাসনে বা সিভিল সার্ভিসে তিনি বাঙালির সংখ্যা বাড়ান। কিন্তু ইতোমধ্যেই শ্বাসরুদ্ধকর আর্থনীতিক ভঙ্গুর পরিস্থিতির মুখে বাঙালিদের মোহমুক্তি ঘটে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সকল প্রচেষ্টা ছাপিয়ে সামরিক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ জাতীয় জীবনে বড় হয়ে দেখা দিল।

ভাষা সমস্যা ঃ শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি উৎকট স্বাদেশিকতার হাতে বাংলা ভাষা প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরেও কম সময়ের মধ্যে বাঙালিরা ঔপনিবেশিক ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছিল। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারিতে পূর্বাঞ্চলে সফরে এসে একতরফাভাবে ঘোষণা করেন যে, "উর্দু এবং উর্দুই" একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। জনসংখ্যার দশ ভাগেরও কম মানুষের এই উর্দু ভাষা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালিদের মতো আলাদা আলাদা মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু উর্দুর প্রতি আনুগত্য এই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল।

কায়েদে আজমের এই ঘোষণা বাঙালি মুসলমানেরা মেনে নেয়নি। যদিও বাঙালিদের সমর্থনে পাকিস্তান অর্জনের জন্য বিরাট ভূমিকা শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই উর্দু ভাষার ঘটনায় সীমাহীন প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্ভব করে। ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে বহু ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা গ্রেফতার হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই প্রথম পাকিস্তানের কারাগারের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অন্যেরা রাস্তায় পুলিশের হাতে নৃশংসতার শিকার হলেন। এই ঘটনার পরে নতুন ধরনের অসন্তোষের সৃষ্টি হলো। আইনসভায় বাঙালি সদস্যদের মাতৃভাষায় কথা বলার অনুমতি বাতিল করা হয়। যখন তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উত্তরে বললেন, "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংযোগকারী ভাষা থাকা প্রয়োজন–। এই জাতির জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন এবং সেই ভাষাটি কেবলমাত্র হতে পারে উর্দু।"

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চরমে পৌঁছলে কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুর হরফের সঙ্গে বাংলা বর্ণমালাকেও গ্রহণ করতে অনিচ্ছাকৃতভাবে রাজি হলো। বেশ কিছু সংখ্যক লোক পুলিশের সাথে সংঘর্ষে নিহত হলো। অবশেষে বাঙালিদের দাবী সরকার মেনে নিলেন এবং উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাও রাষ্ট্রীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

ইসলাম ঃ "উর্দু মুসলিম জাতির ভাষা" লিয়াকত আলী খানের এই জাহির করা উক্তিই ইসলামী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। উর্দু নয় আরবি হচ্ছে কোরানের ভাষা। তার ভাষণে অনুক্ত মুসলিম বিরোধ সংক্রান্ত কটাক্ষ এবং অমুসলমানদের প্রতি অনীহা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর ভাষাভাষী বালুচি, সিন্ধি, পাঞ্জাবী অথবা পশতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সরাসরি কেবল বাংলা ভাষার প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছিল। শুধু অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া এসব বিবৃতিগুলোতে কোনো যুক্তিপূর্ণ সমাধান ছিল না।

এমনকি হাস্যকর সমাধান যে বাংলা ভাষায় হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেননা পূর্ব বাংলার জনসমষ্টির এক বিশেষ অংশ হিন্দু। এ যুক্তি ধোপে টেকেনি। বহু হিন্দু পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন। তবু বাংলা ভাষাকে যেভাবে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা অন্য ক্ষেত্রে হয়নি। বাঙালি মুসলমানদের নানাভাবে অবজ্ঞা ও করুণার চোখে দেখা হয়েছে। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গের গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নুন একবার মন্তব্য করেছিলেন, বাঙালি মুসলমানরা 'অর্ধেক মুসলমান' এবং তারা 'মুরগির মাংস হালাল' করে খায় না। এই অপমানে জননেতা মওলানা ভাসানী তীব্র ভাষা ব্যবহার করলেন, "লুঙ্গি উঁচা করিয়া দেখাইতে হইবে আমরা মুসলমান কি না?"

কুমিল্লার নবম ডিভিশন হেড্‌কোয়ার্টারে আমার সফরকালে আমি দেখেছি পাঞ্জাবী অফিসারগণ বাঙালিদের ইসলামের আনুগত্যের প্রতি সবসময়ই সন্দেহ পোষণ করতো। তারা বাঙালি মুসলমানদের কাফের ও হিন্দু বলতো। এসব বলার প্রকৃত কারণ হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য না মেনে মুসলমানেরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে সমর্থন দিয়েছে। এ ধরনের দোষারোপ করা সত্যের অপলাপের সামিল। পশ্চিম পাকিস্তানের যেকোনো নগরীর মতো, ঢাকা এক হাজার মসজিদের শহর, এ ন্যায্য দাবি করতে পারে। এমন কি পর্যটনের পোস্টারে এর সমর্থন মিলবে। আমি বাঙালি মুসলমানদের অন্যত্র বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি মাত্রায় ধর্মভীরু দেখেছি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নগরীর সহধর্মাবলম্বীদের থেকে মনে হয়েছে রক্ষণশীল ও ধর্মের প্রতি অনুরক্ত।

পূর্ব বাংলায় মদ বিক্রি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে, অনুমোদিত মদের দোকানগুলো শুক্রবারেও খোলা থাকতে দেখেছি– যা পূর্ব বাংলায় কখনোই ঘটেনি। করাচি ও লাহোরে যৌন আবেদনমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ক্যাবারের নাচ হোটেলে চলে, এগুলো ঢাকা ও চট্টগ্রামে দেখানো হলে বা চালু করা হলে সঙ্গে সঙ্গে জনতার রুদ্র প্রতিবাদের শিকার হত।

রমযান মাসে পূর্ব বাংলার সম্পদশালী মুসলমানদের কঠোরভাবে রোযা পালন করতে আমি দেখেছি, যা পশ্চিম পাকিস্তানের সমশ্রেণিভুক্তদের মধ্যে দেখিনি। ১৯৭০ সনে কষ্টকর নির্বাচনী প্রচার অভিযানের মধ্যেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিদিন রোযা রাখতেন। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছি। আমি তাঁর ঢাকার ধানমন্ডির বাসগৃহে সাক্ষাতের জন্যে গিয়ে একথা জেনেছি। রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচিতে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আমার যথেষ্ট ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এদের একজনের সাথে খেয়েছি আর একজনের সঙ্গে মদ্যপানেও শরিক হয়েছি। এসব সত্ত্বেও মুজিব ও তাঁর লোকদের বলা হয় 'কাফের'। পূর্ব বাংলার মুসলমানের প্রতি অকারণ কলঙ্ক লেপন করে যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে পূর্বে তেমনটি করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে সংবেদনশীল বাঙালিদের বেদনাদায়ক অপমানই তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হওয়ার অন্যতম অনিবার্য কারণ হয়ে থাকবে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

"এক পরিবারের একজন খেলেই অন্যজনের পেটভরে না। তাই কেমন করে এবং কোন বিবেচনায় আমাদের অংশের ওপর দাবি জানালে তোমরা আমাদের স্বার্থপর বল? তোমরা, যারা কেবল তোমাদের নিজের অংশই ভোগ করছ না, তোমাদের ভাইয়ের অংশও ভোগ করছ?"

–শেখ মুজিবুর রহমান
আমাদের বাঁচার অধিকার।

আমার মতো অপেশাদারী লোকদের পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পঙ্গু আর্থনীতিক বৈষম্য পর্যালোচনার যে ব্যাপক সংখ্যক তথ্য ও অঙ্ক, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিমশিম খেতে হয়। উপযুক্ত রেফারেন্স থেকে বুলেটিন, স্ট্যাডিগ্রুপস্ এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। এবং যারা শুরু থেকে গবেষণায় এসব অর্থনৈতিক ব্যর্থতাগুলোতে আলোকপাত করেছেন, সেসবের লেখা উল্লেখ করতে হয়।

আর্থনীতিক বৈষম্যই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের সঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাকিস্তান ঋণ গ্রহণকারী অন্যান্য দেশের মতোই আমেরিকা, ইউরোপীয় দেশ এবং জাপানি অনুসন্ধিৎসু তীব্র দৃষ্টির বস্তু হয়ে রয়েছে। অনুমান করা চলে, এসব দেশগুলো পাকিস্তানের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। সুতরাং পাকিস্তানের আর্থিক ও আর্থনীতিক বাস্তবতা নিয়ে অনেক দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাঙালি অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান ও কবীর উদ্দিন আহমদ এবং তিনজন হার্ভার্ড অর্থনীতিবিদের একটি দল এডওয়ার্ড সে ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান এবং স্টিফেন ও মার্লিন পৃথক পৃথকভাবে যুক্তি ও নজিরসহ তথ্যাদি যে প্রণালীতে উত্থাপন করেছেন তাতে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ বলা চলে। উদঘাটিত তথ্যাবলি বেশ চমকপ্রদ। এগুলো হলো :

১। ১৯৬৯-৭০ অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬১ শতাংশ বেশি ছিল। এবং এটা ছিল পাকিস্তানের দশ বছর আগের মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণ।

২। ১৯৫০-৫৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার জন্যে উন্নয়ন বরাদ্দ শতকরা ২০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ। ১৯৬৫-৭০ পঞ্চবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বহুৎ ওয়াদা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন খাত পেয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হলো শতকরা ৬৫ ভাগ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৪ ভাগ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানকে এইভাবে বঞ্চিত করা হয়।

৩। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের দখলি বাজারে বিক্রি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের অদক্ষ শিল্প ইউনিটগুলোতে উৎপাদিত বকেয়া, বাজে দ্রব্যাদির উচ্চমূল্যের বিক্রির আঁস্তাকুড় হিসেবে এই প্রদেশকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। বহির্বিশ্বে পূর্ব বাংলার উদ্বৃত্ত রপ্তানী আয় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করেছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার হয়েছে। পাকিস্তানে পাচার করা হয় ৩১০০ মিলিয়ন টাকার সম্পদ, যার বর্তমান মূল্য ২১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার মন্থর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম। এই স্ববিরোধী সরকারি যুক্তি দেখানো হয়েছে । পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৯৪৯-৫০ সালে ৪১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৩ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬৯ মিলিয়নে। প্রথম দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৯ এবং দ্বিতীয় দশকে এই বৃদ্ধির হার হলো ৩ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৪৯-৫০ সালে ৩২ মিলিয়ন থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৫ মিলিয়ন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৫৯ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যথাক্রমে ৪ এবং ৩ দশমিক ১ ভাগে দাঁড়ায়।

এসব তথ্যগুলো থেকে নিঃসন্দেহেই আওয়ামী লীগের আর্থনীতিক কণ্ঠরোধ ও শোষণের দাবিমানার যথার্থতা ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব বাংলার শোষণ বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়। কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে হবে, ইয়াহিয়া সরকারের অন্যতম অর্থনীতিবিদ (মুখপাত্র) এবং প্রেসিডেন্টের আর্থনীতিক উপদেষটা এম এম আহমেদ তাঁর নিজের মনগড়া একটি আর্থনীতিক সমতার ছবি আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, যা দিয়ে তিনি বর্তমান সরকারের বিদ্যমান আর্থনীতিক বৈষম্যের প্রবাহকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ, এই দাবির যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছে। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসমূহ কেবল বিতর্কের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু মানুষের অশেষ দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ধারণাই এই তথ্যগুলো থেকে লাভ করা যায় না। অথবা প্রয়োজনীয় মানবিক কাঠামোর প্রকৃত বেদনাদায়ক বাস্তবতাকেও এসব তথ্য তুলে ধরতে পারে না। এগুলো সবই সম্পূর্ণভাবে পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের অনুকূলেই তথ্য নির্দেশ করে।

অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে না, এমনকি সেই পশ্চিম পাকিস্তনের একজন লোক সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলায় এলে তিনিও পূর্ব বাংলার দারিদ্র্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। করাচিতে যে কুড়ি বছর আমি ছিলাম তার ভিতর আমি আটবার পূর্ব বাংলায় গিয়েছি। আমি প্রদেশের সর্বত্র ঘুরেছি, মূল ভূখণ্ড থেকে সুদূর দক্ষিণে কক্সবাজারের প্রশস্ত সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত।

এ বছরগুলোতে আমি তিন ডজনেরও বেশি পেশা উপলক্ষে এবং ছুটি কাটাতে উত্তরে রাওয়ালপিণ্ডি লাহোর ও পেশোয়ার গেছি। পাকিস্তানের বিশ বছর পর অর্থাৎ

১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পশ্চিমে কোয়েটা জিয়ারত ও সিন্ধুর নিকটবর্তী হায়দারাবাদ এবং শুক্কুর ভ্রমণ করেছি। আমি উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের ওয়ানার উপজাতীয় এলাকার সামরিক চৌকিতে গিয়েছি। এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে বরফাচ্ছন্ন কারাকোরামের হুনযা এবং গিলগিটেও গিয়েছি। এসব সফরে আমি বিমানে, ট্রেনে, মোটরগাড়িতে ও মিনিবাসে করেছি। যেসব সফর আমি পূর্ব বাংলায় করেছি তা নৌকায়, বিশেষ করে মেঘনা-চাঁদপুর থেকে খুলনায় নয়ন জুড়ানো ভ্রমণ আমি করেছি। অতীত রোমন্থন করে আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও পূর্ব বাংলার মতো অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য দেখিনি। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পেশোয়ারের নিকটবর্তী এলাকায় গুহাবাসী পাঠান উপজাতীদের দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনীয়। ঠিক একই ধরনের অবস্থা সিন্ধুর হারিপ্রজা কৃষকদের। সেখানে গভর্নর লেঃ জেনারেল রাখমান গুল, আট থেকে দশটি লোকের একটি পরিবারকে ছয় থেকে চৌদ্দ বস্তা গমের বার্ষিক আয়ের ওপর বেঁচে থাকতে হয় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যে কোন সভ্য সমাজের কাছে এ ধরনের দুঃখ ও দৈন্য লজ্জার বিষয়। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ দুঃখ ও দৈন্যের জন্য লজ্জাবোধ শুধু তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্ব বাংলার বিরাট এলাকাজুড়ে মানুষের সীমাহীন দুঃখ ও দৈন্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা মেলা ভার। পূর্ব বাংলার দৈন্যদশা শহর ও গ্রামাঞ্চলেও সমভাবে লক্ষণীয় যা পশ্চিম পাকিস্তানে নেই। ঢাকার শীর্ণকায়ার রিকশাচালক রাত কাটায় রিকশায়, দেখতে বয়স চল্লিশ; আসলে বয়স হবে বিশ। বরিশালের জেলেরা, চট্টগ্রামের ডকশ্রমিক, কুমিল্লার ধানী জমির কৃষক এবং সিলেটের রাস্তার ধারে আনারস বিক্রেতাদের দেহের ঐ একই শীর্ণ অবস্থা। পুষ্টিহীনতা, যক্ষ্মা ও অন্যান্য শ্বাসরোধ ও পেটের পীড়া স্থানীয়ভাবে ঘোরতর অসুখ এখানকার নিত্যসহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ধরনের কোনো কিছু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা যাবে না। পূর্ব বাংলার পুরুষের জন্য পোশাক বলতে একখানি লুঙ্গি এবং ময়লা বা ছেঁড়া শার্ট। শাড়ীই নারীদের একমাত্র দেহের আবরণ। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে গরিব গ্রামীণ নারীর জন্যও তিন প্রস্থ আবরণ রয়েছে–সালওয়ার, কামিজ এবং দোপাট্টা। তাছাড়া আবশ্যিকভাবে তারা সবসময়েই কিছু অলংকার পরবে। আর পূর্ব বাংলার নিঃস্ব নারীদের অলংকার নেই, ফুলের হার তারা কখনো পরে। (বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা রূপোর অলংকার কখনো পরে থাকে)। খাবার জুটে কখনো একবেলা, তাও এক থালা মোটা ভাতের সঙ্গে মসুরির ডাল কিংবা একটুকুরো মাছ। মাংস ও ডেইরী সামগ্রী কমই থাকে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানি গ্রামবাসী সবদিন মাংস পায় না ঠিকই তবে যেকোনো ভাবেই হোক দুধ বা লাচ্ছি তারা খাবেই। স্বীকার করছি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও গরিব। কিন্তু তাদের সমস্যাজর্জরিত বাঙালিদের চেয়ে সুখি মনে হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কারণ বোধহয় এই যে, পশ্চিমের জনগণের সুখি হবার সুযোগ এবং উন্নত জীবনের আশা করার মতো সুযোগ রয়েছে। পূর্ব বাংলার ভাইদের মুখে ভেসে উঠেছে আশাহত এবং জীবনযুদ্ধে পরাজিতের চিহ্ন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত বাঙালিদের অসংখ্য

মুখচ্ছবি আমি কখনো ভুলবো না। পূর্ব বাংলার লোকদের নানাদিক থেকে বঞ্চনার ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামান্য একটি অফিসের চাকুরির জন্য কয়েকশত গ্রাজুয়েটদের আবেদনের ভীড় দেখবেন। আর্থনীতিক কণ্ঠরোধ ও বঞ্চনা বিষয়ে পূর্ব বাংলার অভিযোগ যে সত্য, সেসব আপনি সাধারণ দৃষ্টিতেই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা অথবা চট্টগ্রাম শহরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন।

এসব শহরের দোকানগুলোতে জিনিসপত্র ভর্তি আর সেসবই এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানের দোকানে পূর্ব বাংলার জিনিসপত্র খুঁজে পাবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার অসম ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে পূর্ব বাংলাকে যে খেসারত দিতে হয়, তার একটি বিশেষ দিক হলো, পূর্ব বাংলার বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরাসরি ভোগ্যপণ্য প্রাপ্যতার ওপর প্রান্তিক প্রতিক্রিয়া। এসবের প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যগুলো হলো ঃ চা, দিয়াশলাই, কয়েক পদের ঔষধপত্র ও নিউজপ্রিন্ট। পশ্চিম পাকিস্তানের ভোগ্যপণ্য বাজারে এগুলো ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান অবদান। পূর্ব বাংলার লোকদের অভিজ্ঞতা বিপরীত স্রোতমুখী এখানে প্রায় সকল ভোগ্যপণ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়। সেজন্য ঘাটতি নিম্নরেখাগামী।

এই আর্থনীতিক কণ্ঠরোধের নজির পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের প্রাচুর্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে। বাইশটি পরিবারেই শুঁড় দিয়ে পাকিস্তানের সমগ্র সম্পদের ওপর একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব ব্যবসায়ীরাই পূর্ব বাংলার বড় বড় ব্যবসা, কলকারখানা, চা বাগান, পাট, আমদানি এবং রপ্তানী বাণিজ্য, ব্যাংক ও বীমা এমনকি গাড়ি সংযোজন কারখানা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানগুলো আঞ্চলিক দপ্তর বা শাখা দপ্তর হিসেবে। এসবই করাচির প্রধান দপ্তরের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে। এমনকি অফিসের বড় সাহেব তিনিও একজন 'পশ্চিম পাকিস্তানি'। বাঙালিরা যখন অনুযোগ করেন যে, বহিরাগতের কাছে যেতে হয়-তা চাকুরি হোক, কাপড়-চোপড়ের জন্য হোক, দোকানের জিনিসই হোক বা টাকা কর্জ করার জন্যই হোক (কলকাতার মাড়োয়ারি ও পাঠানরা কর্জ দেয়)। এমনকি অফিসের বড় সাহেব তিনিও একজন পশ্চিম পাকিস্তানি কিংবা বিহারী মুহাজের। কিন্তু কেন বাঙালিকে সবসময় 'সর্বগ্রাসী বহিরাগত' উপস্থিতিকে সালাম ঠুকতে হবে? এটা কি উপনিবেশবাদ নয় ? বাঙালির এই হতাশার হাজার পরিসংখ্যান তালিকা দিয়েও তাদের অবর্ণনীয় বৈষম্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা যাবে না।

পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা

গত ২৩ বছরে তোমাদের নেতারা যে নির্যাতন, উপেক্ষা এবং দাসত্বের শাসন-কড়া আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর নামে পাকিস্তান রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের নেতারা আমাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া সহ্য করেনি অথবা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে কিছুতেই সহ্য করেনি, তারা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে।

—তাজউদ্দীন আহমেদ
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
এপ্রিল ১৭, ১৯৭১।

পূর্ব বাংলার বর্তমান বিয়োগান্ত জটিল পরিস্থিতির এক বাক্যে সার-সংক্ষেপ করা যেতে পারে। বাঙালিরা আওয়ামী লীগের পতাকার তলে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে যে পাকিস্তানি পাঞ্জাবীচক্র দেশের ক্ষমতার আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তারা ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না এবং সেনাবাহিনীকে দিয়ে ক্ষমতা ফিরে পেতে তারা তৎপর।

গণতন্ত্রের রায়ের অবমাননা তা'যতই অসংযত মনে হোক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। বরং এই ন্যক্কারজনক অস্বীকৃতির চরম পরিণতি, জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি বারে বারে বিশ্বাসঘাতকতা বা বিগত ২৪ বছরে পূর্ব বাংলাকে শুধু উপনিবেশই সৃষ্টি করেনি, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণজনেরাও এদের হাতে শোষিত হয়েছে। জনতাকে যেসব কর্মচারী "ভয়ানক অপরিচ্ছন্ন" বলে থাকে, তারাই সামরিক আমলাচক্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য মাল-মসল্লা জুগিয়ে বর্তমানে কামানের খাদ্য হয়েছে। শোষণ হলো এদের সরকারি নীতি একনায়কতন্ত্রের বিস্তার এদের পদ্ধতি এবং পাকিস্তানের শুরু থেকেই এই স্বৈরতান্ত্রিক বিস্তৃতি চালু রয়েছে।

পাকিস্তানের কোনোদিনই সত্যিকার অর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। স্বৈরতন্ত্রই এখানে রাজনীতির কেন্দ্রীয় চিন্তায় বিবর্তিত। এটা ব্রিটিশ শাসনের দিনগুলোতে মুসলিম আন্দোলনের অগ্রদূত মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, তেমনি ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ঘটনায় তা প্রযোজ্য। সাধারণ অর্থে মুসলিম লীগ একটি জনগণের দল ছিল কারণ ব্রিটিশ ভারতের বিক্ষুব্ধ মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই দলের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে সোচ্চার হয়েছিল।

কিন্তু মুসলিম লীগ সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণি এবং একদল শিক্ষিত শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে সেবা করেছে। এইসব সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণিরা ছিলেন পাঞ্জাব ও সিন্ধুর ভূস্বামী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান বংশধরেরা এবং যুক্ত প্রদেশগুলো থেকে আসা নবাব ও নবাবজাদারা। এবং শিক্ষিত শ্রেণিতে ছিলেন, যুক্তপ্রদেশের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আর বোম্বের চতুর ব্যারিস্টারগণ যাঁদের অন্যতম হলেন উঁচুমানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বৈরাচারী কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এঁদের দ্বারাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রভাবিত হত। এঁরা কংগ্রেস ও ঘরমুখো ব্রিটিশ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। তাঁরাই শিশু মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল ও ভোগের একচেটিয়া দাবি করেছেন।

তারিক আলী তাঁর বই 'পাকিস্তান-মিলিটারী রুল অর পিপল্স ওয়ার'-এ মুসলিম লীগের সত্যিকারের চরিত্র উন্মোচন করেছেন।

> পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ সরকার একটি ফরমান জারি করে তাঁদের শ্রেণি-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ ফরমানে ১৯৪৪ সালের মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো গোপনে অথবা প্রকাশ্যে কোনো প্রজার পড়া অপরাধ ছিল, কেননা তাতে কিছু বৈপ্লবিক চিন্তার উল্লেখ ছিল। এই অভিযোগে অভিযুক্ত একজন কৃষকের শাস্তি ছিল স্থানীয় ভূ-স্বামীর চাষের জমি থেকে উৎখাত হওয়া। স্বল্প কথায় প্রজাকে বলা হত ঃ স্থানীয় ভূ-স্বামীকে হয় সমর্থন করো, নতুবা জমি ছাড়ো।

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে এই শাসকচক্র জোট বেঁধেছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতা পাঞ্জাবী ও তাদের খালাত ভাই হাজারা, পাঠানদের কাছেই সংরক্ষিত রয়ে গেল। এই সবকিছু একশ্রেণির আমলা ও মধ্যবয়সী সামরিক কর্মচারীদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মধ্যেই তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এইসব কর্মচারীরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে শুধু বন্দুকের জোরেই ক্ষমতাকে মূলধন করেছিলেন তাই নয় সে সঙ্গে অসন্তোষের সাগরের সুশৃঙ্খল হেতুও ছিল এটাই। পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আমলা ও সামরিক বাহিনী দুটি দল রয়েছে–এ উক্তি সেক্ষেত্রে অযৌক্তিক নয়।

যদিও বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন পাকিস্তান অর্জনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় বাঙালি নেতৃত্ব ছিল দ্বিধাবিভক্ত, অকর্মণ্য, সংখ্যায় সীমিত ও অকেজো। বিস্মিত হবার কিছু নেই, এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুল হক এই দুইজন পাকিস্তান আন্দোলনের পথিকৃতকে মুসলিম লীগের আনুকূল্য থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরবর্তী বছরগুলোতে বাঙালি দ্বিতীয় শ্রেণির রাজনীতিবিদেরা নিজেদের জনগণের দাসত্বের হাতিয়ার হিসেবে এঁদের হাতে নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকলেন।

যে উচ্চ আশা ও ধর্মীয় আদর্শিক উচ্ছ্বাস নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বাস্তবরূপ পেলে অবস্থা ভিন্ন হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। জিন্নাহ সাহেব নিজেই নতুন রাষ্ট্রে কর্তৃত্বের ছাপ রাখবার প্রয়োজন মনে করলেন এবং নিজেই গভর্নর

জেনারেল পদে আসীন হলেন। জিন্নাহ সাহেবের এই সর্বগ্রাসী ভূমিকার উল্লেখ করে অ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসন তার "মিশন উইথ মাউন্টব্যাটন" বই-এ লিখেছেন, "এখানে বাস্তবরূপে একজন ভয়ংকর কায়েদে আযমের মধ্যে পাকিস্তানের শাহানশাহ, ক্যান্টারবারীর আর্কবিশপ, স্পীকার এবং প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীভূত হয়েছে।" জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকেই শুধু অকেজো করেননি তিনি আমলা ও সেনাবাহিনীকে মন্ত্রিদের এড়িয়ে সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট করতেও উৎসাহিত করেছেন। পূর্ববর্তী এসব নজির পরবর্তীকালে স্বৈরতন্ত্র ও ধ্বংসের পথ বিস্তৃত করে। একবার ওপরের পদে আসীন হতে পারলে, সামরিক বাহিনীদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ক্ষমতা হাতে রাখার। এই প্রবৃত্তির কৃতি পুরুষ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী–যিনি দেশের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ও পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। তিনি ছিলেন যেমনি উগ্র ধর্মান্ধ মুসলমান, তেমনি উগ্রবাদী পাঞ্জাবী। তিনিই পাঞ্জাবী আমলাতান্ত্রিক উত্থানের প্রাথমিক কাঠামো সৃষ্টিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, বিগত ২০ বছরে, যাঁরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন–হয় তাঁরা আমলা, পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদে রূপান্তরিতনেতা নতুবা সেনাবাহিনীর অফিসার। এঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দেশের চাকরির রীতির পদ্ধতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্ত্রিসভায়ও তাদের সুযোগ নির্ধারিত ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমলাদের অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশকে সরকারি অস্বাভাবিক যুক্তি দেখানো হতো অথচ এসব পদ জনপ্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শুধু আমলাদের মধ্যেই এসব প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব পাওয়া যেত–সাড়ে সাত কোটি মানুষ হলো প্রতিভাহীন–এই কটাক্ষ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এসব ছিল সুদীর্ঘ অন্যায়ের ফলশ্রুতি। কিন্তু দক্ষ গণমাধ্যমে প্রচার নিপুণভাবে পরিচালনা করে, পরে আমরা দেখতে পাবো, এই অপমান জনগণ হজম করতে শুধু শিখলোই না বরং এসব পছন্দ করতে লাগলেন।

আমলাতন্ত্রের অবরোহণ সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও সামর্থ্যের অনুপাতে বেড়ে চললো। আমলাবর্গ অসহনীয়ভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। ১৯৫১ সালে ঢাকা ক্লাবে আমার প্রথম সফরের কথা আমি কখনো ভুলবো না। টমবোলা (বিংগো) অধিবেশন সবে শেষ হয়েছে। ঠিক সে সময় দীর্ঘকায় সুদর্শন এক দম্পতি দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সবকটা চোখ সেদিকে নিমিষে ঘুরে গেল। জনৈক ঠাটঠমকওয়ালা শিল্পপতি সালম জানাতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। এ ধরনের উত্তেজনার কারণ জানতে চাইলেন একজন বাঙালি সম্পাদক বললেন, "ওহ্ হো উনি চীফ সেক্রেটারী। মিঃ এবং মিসেস সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে ধূলার পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।"

আর একবার করাচির এক বিলাস বহুল হোটেলে কোটিপতি ভ্রাতৃদ্বয় সন্তানদের বিবাহ অনুষ্ঠান করছিলেন (এ ধরনের রক্তিম বিবাহ এ সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা, কেননা সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে এসব বিবাহে)। সুসজ্জিত মঞ্চে দু'হাজার আমন্ত্রিত বরপক্ষের অতিথিদের খাওয়াচ্ছেন এমন সময় সংবাদ এলো শিল্প

সচিব এসেছেন। তখন সেখানে হৈ চৈ পড়ে গেল। একজনের টমাটোর জুস গড়িয়ে গেল অন্যদিকে, অন্যদিকে আমন্ত্রণকর্তা তাড়াতাড়ি করে মাননীয় অতিথিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে চায়ের কাপ উল্টে দিলেন। হাসির রোল থামলে–এক সময় কানে ফিস ফিস আওয়াজ এলো ঃ "দেখতে পাচ্ছি বাসটার্ডগুলো আর একটা কারখানার জন্য আবেদন করছে।"

আইয়ুব হলের রেস্তোরাঁ, জাতীয় পরিষদের অস্থায়ী ভবন হিসেবে পরিচিত, সেখানে জাতীয় পরিষদের সভা-কক্ষের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দঘন পরিবেশ ছিল। সবসময় সেখানে লোকের ভীড় থাকতো। কিন্তু আশাতীত হলেও যারা ওখানে বসে থাকতেন তাঁরা সম্মানিত পরিষদ সদস্য নন, সকলেই উচ্চপদের আমলা। যে ভঙ্গিতে এসব সদস্যরা আরো কফি এবং কেকের জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ দিতেন তাতে তাঁদের অবস্থান জানতে সন্দেহ থাকে না। তাঁদের দীনতা দেখে আমার বন্ধু মানসুরি মন্তব্য করলেন, "এই অদ্ভুত লোকদের অর্থের প্রতি দুর্নিবার চাহিদা রয়েছে, তিন বছর আগে যখন এঁরা প্রথম পরিষদে এলেন, তখন রিকশা চড়তেন পোশাক পরিচ্ছদও ছিল খুবই সাধারণ। এখন এঁরা টয়োটা চালান, পোশাকেও বাহার এসেছে।"

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে কায়েদে আযম যখন মারা গেলেন–নিচের সারির লোকেরা যাঁরা তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন, তাঁরা জিন্নাহ্ সাহেবের স্বৈরাচারী হাবভাব রপ্ত করে নিতে দ্বিধা করলেন না। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর কর্তৃত্ব জাহির করেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আর অন্যদের ছিল স্বার্থপরতার উদ্দেশ্য। তাঁরা রাজনীতির পাকে জড়িয়ে গেলেন। সমস্যা স্থানীয়ভাবে প্রাদুর্ভূত হলো। পাকিস্তান টাইমস-এ তারিক আলীর একটি উদ্ধৃতি থেকে এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

> "সবসময়ই শাসকশ্রেণি জাতীয় বিষয়াদি বিশেষ নোংরা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন এবং সময়ের নিয়মানুবর্তিতা মাফিক সেটা তাঁরা করেছেন। অসংখ্য কায়েমি স্বার্থবাদী মহল থেকে যে চিৎকার উঠতো তা জনগণের মুক্তির জন্য নয় বা নূন্যতম বৃহত্তর গণতন্ত্রের জন্যও নয়-সেটা ছিল বৃহত্তর একনায়কত্বের জন্য।"

এই বিস্তৃত একনায়কত্বের প্রয়োজন ছিল ব্যক্তি ও প্রাদেশিক পর্যায়ে একীভূত করে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। এসবের মুখ্য উপাদান ছিল– সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং কৃষি থেকে মোটা আয় আদায়, একচেটিয়া পৃষ্ঠপোষকতা যা থেকে ভাগ্যবানদের অর্থনীতিতে লোভের সামাজিক উপযোগীতা আদায়ের সৌভাগ্য সৃষ্টির অধিকার।

পাঞ্জাবের ছিল উভয় ক্ষেত্রেই খুঁটির জোরের প্রাবল্য। এখানেই ছিল বৃহত্তম প্রভাবশালী এবং বোধহয় শিক্ষিত ভূস্বামীরা। পাঞ্জাবীদের অনেকেই ছিলেন এই ভূস্বামী পরিবারের বংশধর। আবার এঁরাই ছিলেন সিভিল সার্ভিসের মেরুদণ্ড এবং সামরিক বাহিনীর ক্যাডারভুক্ত উঁচু পদের অফিসার। ব্যক্তিগত পাঞ্জাবী স্বার্থ অবশ্যম্ভাবীরূপে অধিকৃত হয়ে দখল বাঁধতে লাগলো। উগ্র পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষমতার রাস শক্তভাবে বাঁধতে তৎপর হয়ে উঠলো।

"তারা অন্য কাউকে নিঃশ্বাস নিতে দেবে না।" প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হবার পর আমাকে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে সোহরাওয়ার্দী এ তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন। যদি এসব আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্যরূপে বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে, তা হত শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে। এতে পাঞ্জাবী গোষ্ঠীর মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতো না, কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খানের বহুত বড়াই করা পরিকল্পনাগুলোসহ পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারও এক হাস্যকর অনুকরণই হয়ে রইলো। কৃষি আয়ের ওপর কোনো আয়কর কখনো বসানো হয়নি। এমনকি ১৯৭১ সনের জুনের সমস্যাসংকুল বাজেটেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সরকার যখন পূর্ব বাংলায় সামরিক অপারেশন চালাতে গিয়ে এক রকম দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল তখনও কৃষিকর ধার্য করতে পারেনি। অথচ সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি বিধিবিধান, নিয়ন্ত্রণ, পারমিট এবং উঁচু পর্যায়ের আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতা আগের মতোই নিপুণভাবে বোনা ছিল।

উল্লেখযোগ্য, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান উভয়েই যে কয়েকশ' ঘুষখোর আমলাদের চাকুরিচ্যুত করেছিলেন তাঁরা অসৎ উপার্জন বহাল রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন। এঁদেরকে আপনি রাজধানী ইসলামাবাদের ক্লাবে বা সুদূর করাচির সিন্ধু ক্লাবে যেকোনো দিন গলফ অথবা ব্রীজ খেলায় দেখতে পারেন। এঁদেরকে আপনি দেখবেন পাকিস্তানি সমাজের বাছাই করা লোকদের সঙ্গে, বর্তমান প্রশাসনের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় ও হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে। অন্যান্য সভ্য সমাজে সরকারি দুর্নীতিকে খুব কমই এমন উদারভাবে গ্রহণ করতে দেখা যেত।

এই ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিরোধে সময় সময় রাজনৈতিক হুল্লোড়ে নটের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পটের পরিবর্তন হয়নি। আর যা ছিল গণতান্ত্রিক অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এক ব্যবস্থা। এ বিষয়টি রেকর্ড করার মতো যে বিগত এগার বছর পাকিস্তানের তথাকথিত সংসদীয় সরকারের সাতজন প্রধানমন্ত্রীকে হয় হিংসাত্মক উপায়ে নতুবা সামরিক আমলাচক্রের আদেশে অপসারণ করা হয়েছে। নির্বাচনী পদ্ধতিতে কখনো সরকার পরিবর্তন হয়নি। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় রহস্যজনকভাবে নিহত হলেন। এ বিষয়ে আগেই বলেছি, তাঁর নিহত হবার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কখনো দেয়া হয়নি। সময় সময়ে বলা হয়েছে তিনি পাঞ্জাবী চক্রান্তে নিহত হয়েছেন। এটা সত্যি হতেও পারে কিংবা নাও হতে পারে। তবে এ কথা সঠিক, তাঁর স্পষ্টভাষিণী বিধবা পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খান এবং দু'জন প্রধানমন্ত্রী গুলি চালানোর গোলমেলে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন যিনি লিয়াকত আলী খানের স্থলাভিষিক্ত হলেন, তিনিও পাঞ্জাবী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের দ্বারা অপসারিত হলেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন অপরিচিত, তাঁকে ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত পদ থেকে ডেকে এনে রাজকীয়ভাবে গদিনসীন করা হলো। পরে তিনি

আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ছিল জারজতুল্য চাকুরি। পদ থেকে অপসারণের ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত করানো হয় এবং এই অপমান যেন তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়নি ভেবে কয়েক মাস পরেই আবার রাষ্ট্রদূতের পদে ফেরত পাঠানো হয়। মোহাম্মদ আলী কখনো পরিষদ বিতর্কে পরাজিত হননি। একমাত্র তাঁর দলীয় লোকেরাই তাকে উৎখাত করেছেন।

প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল থেকে রাজনীতিবিদ এবং অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এক সস্তা রাজনীতির চাল মেরে তারই নামধারী মিঃ আলীর উত্তরাধিকারী হলেন। মুসলিম লীগ পরিষদ পার্টি মিথ্যা কথার ফাঁদে ফেলে তাঁকে দলনেতা নির্বাচিত করলেন এই ভেবে যে তিনি বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনায় বসবেন এবং একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন। সোহরাওয়ার্দী সেই মহান মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তখন গভর্নর জেনারেল হাউসে পৌঁছে গেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জার কাছে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নিয়েছেন। তিনি তখন পাকিস্তানকে প্রথম শাসনতন্ত্র দিতে এগিয়ে এলেন। বাঙালিদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা এক রাজনৈতিক রফার ভিত্তিতে এর খসড়া প্রণীত হয়। পরবর্তী চৌদ্দ বছর পূর্ব বাংলা প্রতিনিধিত্বের এই কুৎসিত সংখ্যাসাম্য বা প্যারেটি ফর্মূলাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখান করেছে।

যদিও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী একজন অন্তর্গোষ্ঠীয় সদস্য তবু সহকর্মীদের কাছে উচ্চাভিলাসি হিসেবে তিনি প্রমাণিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের অবস্থান একজন সর্বাত্মক ক্ষমতা লাভেচ্ছুকের দ্বারা বিপদ সংকুল হতে পারে। সেজন্যেই তাঁকে জোর করে অপসারিত করে তাঁরা সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে আনুগত্য দেখালেন। ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেন্ট মির্জা ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছে গেছেন। পরিষদে সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব ছিল। সেজন্যে তিনি প্রেসিডেন্ট মির্জার খেয়ালের হাতে বন্দি হলেন। যখনই তিনি তাঁর অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তখনই অভদ্রভাবে পায়ের তলার গালিচা সরিয়ে নেওয়া হয়। এবারে মুম্বাইয়ের একজন ব্যারিস্টার আই. আই. চুন্দ্রিগড় 'ম্যাড হেটারস' নাচে কিংবা উন্মুক্ত নাচে যোগ দিতে এলেন। আরেকজন মাত্র চল্লিশ দিন ক্ষমতায় থেকে মালিক ফিরোজ খান নুনের জন্য পথ করে দিলেন।

এই পাঞ্জাবী সামন্ত ভূস্বামী পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় আনাড়ির মতো এই জটিল বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে তাঁর সুনামের যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। কিন্তু সেসব ভুলে গিয়ে ১৯৫৭ সালে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার প্রয়োজনে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। ফিরোজ নুনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে ডাকা হলে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। যদিও লেডি ভিকারুননিসা নূন (ভিকি)-এর আশংকা ছিল গুরুতর। তাঁর স্বামী শপথ নেবার এক ঘণ্টা পূর্বে আমাকে

বলেছিলেন, "এসব বড় চাকুরির ব্যাপারে আমি সবসময় বড় উদ্বিগ্ন থাকি, এগুলোর সব সময় দুঃখজনক পরিণতিই ঘটে। আমি আশা করি এবার হয়তো তা হবে না।"

এই ভদ্র মহিলার অনুমান সঠিক হলো। আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো-এবার কেবল নুনের ব্যক্তিগত পরাজয় নয় এবার ঘটলো জাতীয় 'দুর্যোগ'। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাসেরও কম সময়ের আগে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদকে পদাঘাতে উল্টে দিয়ে প্রকাশ্যে স্বৈরতন্ত্র যুগের প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশেষে ঘাপটি মারা দানব গুহাব্যুহ থেকে বের হয়ে এলো। এ ধরনের রাজনৈতিক বিকাশ, পরিশেষে এ ধরনের সর্বনাশই ডেকে আনে তা' প্রমাণিত হলো। এমনকি পাকিস্তানি গণতন্ত্রের ভণ্ডামি যা বছরের পর বছর টিকে ছিল সেটুকু শেষ করে দিয়ে, সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্র জনগণকে তার শোষকের মুখোমুখি দাঁড় করালো।

পরবর্তী দশ বছর পাকিস্তানকে এক নির্দয় শাসনে শাসিত হতে হলো। লর্ড একটনের "Absolute power corrupts absolutely" অর্থাৎ অপরিমিত ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ করে তোলে-উক্তি উপস্থাপন- পাকিস্তানের আগে খুব ব্যবহার হয়েছে। আইয়ুবের ক্ষমতার প্রধান যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্রের স্বপ্নাতীতভাবে প্রাধান্য লাভ করলো। দাসত্ব, মোসাহেবি এবং ঘুষের নানাবিধ সংস্করণ জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন হালচালের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্যিকার রাজনৈতিক পেশাগত, ব্যবসা ও আমলাতান্ত্রিক সাফল্য ধারণাতীত হয়ে যাবে–যদি না সঠিক স্থানে প্রয়োজনীয় মাখন মাখান হয়। জনগণের এরূপ দুর্বিসহ গ্লানিকর অধঃপতন আর কখনো হয় নাই। 'প্রভু তোষণ ও তৈল মর্দন' অতীতে জনগণ এ ধরনের অপমানকর পরিস্থিতিতে কখনোই ছিল না। এই হলো পাকিস্তানের 'গণতান্ত্রিক' ঐতিহ্যের স্বচ্ছ নমুনা।

এক নতুন সূচনা পর্ব

প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদের কাছে এটা খোলসা করে বলতে চাই যে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

–প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান
২৬ মার্চ, ১৯৬৯।

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ সকালে পাকিস্তান এক নতুন শাসনতান্ত্রিক সংসদীয় গণতন্ত্রে যাত্রার আনন্দে শুরুতেই দেশ জেগে উঠলো। নিদেনপক্ষে সকলেই সেরকম আশা করেছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কুটিল স্বৈরাচারী ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, যিনি তাঁর সর্বাত্মক স্বৈরশাসনের উপস্থিতি দিয়ে জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। দেশের ইতিহাসে জনগণের নজিরবিহীন গণঅভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। সেই ঘটনার ইতিহাস–এমন এমনিতেই একখণ্ড বইয়ের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে এ ঘটনা অনেক গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে। আমার উদ্দেশ্য এখানে ঘটনার ফলাফলের ওপর আলোকপাত করা। বিগত ২২ বছর ধরে পাঞ্জাবী আধিপত্যপুষ্ট আমলা সামরিক চক্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য হাস্যকর যে রাজনৈতিক অবকাঠামো পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল, তার সম্যক চিত্র এখানে আমি তুলে ধরবো।

এই নড়বড়ে অবস্থা যতই গতানুগতিক ও নিরস শোনাক। তবু পাকিস্তানিদের এক অদমনীয় আন্দোলনের ভয়ংকর বিজয়ের মধ্যে পাকিস্তানিরা নতুনভাবে রক্ষা পাওয়াকে তারা সাহসী পৃথিবীর আলোতে নতুন আশার সঞ্চার বলে মনে করেছিল। এটা ছিল জনগণের বর্তমানকালের মহত্তম বিজয়। এতে তাদের আনন্দ প্রকাশ অস্বাভাবিক কিছু নয়। পক্ষান্তরে, শক্ত বুননের শাসকশ্রেণির জন্য ভয়ংকর দুর্ঘটনা জেনে নিল। তাঁরা এখন পিছু হটেছেন। এই দুয়ের মধ্যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাসনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাকিস্তানের সবকটি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই চরম দিনের বিকেলে করাচির জিমখানা বিশেষতঃ সিন্ধু ক্লাবের খাবার ঘর ও লাউঞ্জে স্বাভাবিকের চেয়ে জনগণের ভীড় ছিল বেশি। এদের মধ্যে মিল মালিক, ব্যবসায়ী, অফিসার এবং দালালরা সমবেত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গুঞ্জন করতে দেখা গেল। অনেকে জেনারেল ইয়াহিয়ার যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললেন। একজন গুজব ছড়ালো যে জেনারেল ইয়াহিয়ার হেড কোয়ার্টারে রক্ষিত ব্যক্তিগত ফাইলে, অপসারিত ফিল্ড

মার্শালের চেয়ে তিনি বেশি বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। বড় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মুখে তার উন্নত জীবনের প্রতি আকর্ষণের কথা বলতে তাদের মুখ উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠলো। বিগত বিশ বছর তারা এই সূত্রের উপর নির্ভর করে প্রতিটি মানুষের মূল্য আছে জেনেছে। ইচ্ছা করেই তারা এসবের মূল্য দিয়েছে–আবার অনেকবার অর্থ বিনিয়োগে খেসারতও দিয়েছে। এ স্বভাব পরিবর্তন হবার নয়–তাছাড়া এসবের কারণও নেই।

এসব বনোৎসবে শিয়ালদের ধূর্ততাও লেগে থাকার ধৈর্য এদেরকে সিংহের চেয়ে বেশি সম্ভার সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছে। কেননা বেসামরিক ও সামরিক আমলাচক্রের অর্থলোভের প্রতি এদের অঢেল বিশ্বাস ছিল। পাকিস্তানের ভাগ্যের এ নব মুহূর্তে এদের একমাত্র প্রচেষ্টা, বাজারে এসব কথা চালু ছিল। নতুন সামরিক কর্তৃত্বের তথা সামরিক হেড্ কোয়ার্টারের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, লাইন লাগানোর পথ বের করা। এটাই হলো সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পথ। সেজন্য এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে, টমেটো রসে গলা ভিজিয়ে এবং পানীয়-মদ কিনে চারিদিকের খবরাখবর সংগ্রহ করেছে। এদের একজন মন্তব্য করে বললো, "আলীবাবা ভেগেছে, কিন্তু চল্লিশ চোর ত আর যায়নি।"

যখন এটা জানাজানি হলো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ছেলে এক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির "জুনিয়র এক্সজিকিউটিভ" তখন একজন মক্কেল নিচু স্বরে তার খোঁজাকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ যেকোনো মূল্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। পরে ফাঁস হয়ে গেল যে পূর্বসূরির মতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ছেলের নিশ্চিত আশ্রয়ে ধরা দেননি। সেই ভদ্রলোকটি (আইয়ুব খানের পুত্র গরহর আইয়ুব) বার মাসের মধ্যে ক্যাপ্টেন পদ থেকে অবসর নিয়ে শিল্পের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ছেলেকে এসব বড় ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে দূরে সরিয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠালেন। যা হোক এদের মধ্যে নতুন টোপ পাওয়া যাবে–আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে রাজনীতিতে যারা সম্প্রতি বেশ প্রাধান্য পেয়েছে এদেরকে। ছয় মাসের অভ্যুত্থানের ঘটনা যা, পুলিশের নৃশংসতা বা সামরিক বাহিনীর বুলেট স্তব্ধ করতে পারেনি। সরকার পরিচালনায় জনগণের বৃহত্তর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। ১৯৫৮ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র ছেঁটে ফেলা ঠিক হয়নি এখন স্বীকার করা হচ্ছে। এ ভুলই এখন জনগণকে প্রকৃত শোষকের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। অতএব এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যতক্ষণ শোষণের প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে তুলে না নেয়া হয়, ততক্ষণ জনগণের সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি যেকোনো রকমফের ভাবে মেনে নিয়ে শান্ত করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান হল। অত্যধিক ব্যস্ত-বাগীশ রাজনীতিকদেরও ধারণা এরূপ ছিল। যখন সবকিছু বলা ও ধন্দা হয়ে যাবে তখন তারাই ময়দানের ঘোড়া হয়ে উঠবেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ভাষণে উল্লেখযোগ্য অংশ এই গণদাবির সুরটি অনুরণিত হয়েছে ঃ

"সামরিক আইন জারির পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং শাসনব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার প্রথম এবং মুখ্য কাজ হলো জনগণের পছন্দমতো শাসন ব্যবস্থায় স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, নিরপেক্ষতা ও নিশ্চয়তার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। আমাদের যথেষ্ট প্রশাসনিক শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা রয়েছে। আমি এসব দেখবো কোনোভাবেই যেন এসবের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রশাসনের প্রত্যেক সদস্যকে এ গুরুতর বিষয়ে সাবধানবাণী জানিয়ে দিচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদের কাছে খোলসা করে বলতে চাই যে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থ, পরিচ্ছন্ন এবং সৎ প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পূর্বশর্ত। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র দেয়া এবং অন্যান্য সব রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো যা জনমন বিক্ষুব্ধ করে আসছে সেসবের সমাধান খুঁজে বের করা।"

প্রেসিডেন্টের এসব কথায় জনগণের আশানুরূপ সাড়া মিললো। দেশের সংবাদপত্রগুলো, যারা বহুদিন ধরে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছিলেন, তাঁরাও তাৎক্ষণিকভাবে 'নব ত্রাণকর্তা'র 'দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীর' এবং 'জনগণের বিজয়' উল্লাসে ফেটে পড়লেন। সংবাদপত্রের কলামে বিভিন্ন মহলের উল্লসিত প্রশংসার বান ডেকে গেলো। বিশেষতঃ আইয়ুবের তদানীন্তন রাজনৈতিক সহকর্মী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক নেতা, পেশাধারী ছাত্র-এমনকি শিল্পী ও লেখকেরা, যাঁরা এতদিন হিসেবীর মতো চুপ করে ছিলেন–তাঁরাও প্রশংসা ও স্তুতিতে উদ্বাহু হয়ে উঠলেন। তাঁরা এখন পরাজিত নেতার কাটা-ছেঁড়া করাতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এসব কথা একজনের জন্য যথেষ্ট। এসব বর্ণনার দৃশ্যাবলী এতই অপমানজনক ছিল যে নতুন শাসকগোষ্ঠীকে তা বন্ধের নির্দেশ জারি করতে হলো। যদিও তা জনগণের ইপ্সিত ছিল। সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকার সম্পাদকের কাছে বার্তা পাঠান হলো ঃ

'কোনো ব্যক্তিচরিত্র হনন নয়, গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে, রুচিহীন একঘেয়েমি আর নয়, শুধু সম্মানিত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছাপানো যাবে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কুৎসা ছাপানো যাবে না।'

যদিও তাদের প্রচলিত প্রশংসা করা অস্বীকৃত হলো তবু পত্রিকাগুলোর সমালোচনা করার যথেষ্ট প্রসঙ্গ ছিল। যাহোক, নতুন প্রেসিডেন্ট জনগণের দাবির প্রতি বেশ ভালোভাবেই সাড়া দিয়েছেন। পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব নির্ভর আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট-স্টাইল সংবিধান ছেঁটে দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। ধিকৃত আমলাতন্ত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের সবকিছুতে শুধু সৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়নি। সামনের

মাসগুলোতে দুঃখের সঙ্গে সেটাই আবিস্কৃত হইল। কিন্তু সে সময় চরম নিন্দুকও জনগণের প্রশান্ত মনোভাব দেখে চুপ করে গিয়েছিল। তবে সদিচ্ছার পরীক্ষা এত তাড়াতাড়ি করা হয়নি। এই নতুন নেতৃত্বকে সন্দেহাতীত ভাবার সময় দিতে হবে।

এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে জনগণ জানতেই পারলো না যে তাদের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অনেক দূর চলে যাচ্ছে। তারা বস্তুত একটি বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আইয়ুব খান তার অফিসার ও রাজনীতির সাগরেদদের সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ত অন্য ব্যাপার।

দেশের ক্ষমতা এখনো সামরিক বাহিনী ও তাদের উপদেষ্টাদের হাতেই রয়ে গেছে। স্বীকার করতে হয়, পুরনো গার্ড পরিবর্তন হয়েছে–নতুনকে জনগণের দাবির প্রতি সাড়া দিতেই হবে। কিন্তু তারা একই শ্রেণিস্বার্থ থেকে উদ্ভূত এটা তো অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত অর্থে ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে, মিউজিক্যাল চেয়ারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহমান এটা তার এক অন্য রূপ। যাঁরা এ বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য মূল্যায়ন করার শ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য এটা গভীর চিন্তার কারণ হয়েছে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এমনকি রাজনীতিকরাও এই বিজয়ে বুঁদ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের জন্য এটা বাস্তব হলো যে, আইয়ুব খানকে উৎখাত করা হয়েছে–এবং ইয়াহিয়া খান নব সূচনার প্রতিশ্রুত দিয়েছেন। তাঁরা এটা ভাবতে ভুলে গেলেন যে, নতুন প্রেসিডেন্ট কেবল স্বৈরাচারী সামরিক নেতৃত্বের ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। যেমন–সারা বিশ্বের একনায়ক সামরিক নেতৃত্ব যা করে থাকেন। এবং সর্বজনীনভাবেই এরা প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকেন। এটা কিন্তু প্রথমবারের মতো নয়, অন্যবারের মতো পাকিস্তানি জনগণ আত্মসন্তুষ্টিতে নিজেদেরকে বোকা বানালো।

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দেয়া ওয়াদা কী আন্তরিক ছিল? গত আড়াই বছরে দেশের রাজনীতিতে এই একটি প্রশ্নের উত্তর বিপর্যস্ত হয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বির্পযস্ত অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ। যাঁরা প্রেসিডেন্টের সাথে ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর কঠোর, স্পষ্টভাষিতা, সামরিক অনস্বীকার্য মনোহারিত্ব গুণে আকর্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশি সাংবাদিক, ব্রিটিশ পার্লামেন্টর সদস্য, কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তাঁরা প্রেসিডেন্টের সদিচ্ছা সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করেননি। যখন এঁরা দেশের ভয়ংকর বাস্তবের সম্মুখীন হন তখনও এঁরা ইয়াহিয়া খানের ত্রুটিগুলোকে তাঁর অনুচরদের ত্রুটি বলে বাতিল করেছেন। তাঁকে কেবল অজ্ঞতার এবং তাঁর ম্যাকিয়াভেলি কর্মচারীদের ওপর অন্ধ বিশ্বাস রাখার অপরাধে অপরাধী করেন। হয়ত এর মধ্যে সত্য থাকবে কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করলে তাঁর রাজনীতির অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। তিনি যে সামরিক প্রাতিষ্ঠানিকের পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন এটা কিন্তু ঔৎসুক্যের সঙ্গে অস্বীকৃত হয়।

প্রেসিডেন্টের উন্নত জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং সহকারী স্টাফ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে একজন বিশ্বনিন্দুক বর্ণনা দিয়েছেন যে, প্রতিদিন একখানা কমিক

বই তৈার করা হত–সেটাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন–এবং এগুলোই তাকে বিপথগামী করেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কর্তৃত্ব সব সময়ে ছিল। একমাত্র তিনিই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর উপদেষ্টারা তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকবেন, তবে তাদের ভূমিকা ছিল গৌণ। এটা যুক্তিহীন ছিল না যে তিনি জনসমক্ষে প্রায়ই নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান, সামরিক আইন প্রশাসক এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিতেন।

তাঁর কথামতো স্টাফদের কাজকর্ম এবং গোলমালের প্রতি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক উদাসীনতা, এটা বলা চলে না। তিনি দেশের সব কাজের প্রতিই গভীর নজর রাখতেন। এটা তিনি করাতেন নিজস্ব সংবাদদাতা ও গোয়েন্দা বিভাগের জটিল নেটওয়ার্কের মধ্য থেকেই। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট করতেন। যদিও তারা প্রধান বিষয়গুলো যেমন নির্বাচন সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছেন বা মূল্যায়ণে ত্রুটি ঘটায় এটা হয়েছে–তা ঠিক নয়। এটা তাঁদের ঘটনাকে প্রভাবিত করতে না পারার ত্রুটি। সেনাপতি হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর কঠিন মুষ্ঠিতে দেশের ক্ষমতা ধরে রেখেছেন। উচ্চ পদে পদোন্নতি, সিনিয়র পদে নিয়োগ, সামরিক নৌ এবং বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলোর চলাচল তাঁর অনুমতিক্রমে ও জানামতেই হতো। তিনি সামরিক বাহিনীকে শাসন করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই দেশ শাসন করতেন।

আন্তরিকতার কথায় ফিরে আসি, ১৯৬৯ সনে ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তিনটি ওয়াদা করেছিলেন, সেগুলো ছিল– দুর্নীতি ও অদক্ষ প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন করা; পুনরায় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো এই যে, তিনি প্রথম দুটি ওয়াদার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি আইয়ুব খানের ধ্বংসের কারণগুলোর প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। সেসব সাম্প্রতিক রাজনীতিক মহাবিপ্লব অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তিনি তৃতীয় ওয়াদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য বলেননি। তিনি রাজনৈতিক সংস্কার করতে গিয়ে প্রশাসনের পরিচ্ছন্নতা করে সত্যি বলতে একটি বড় কাজ করেছেন। বেসামরিক ও সামরিক তদন্তকারী এজেন্সীগুলোর নোংরা তুলতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করলো। এবং সমুচিত প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা গর্ত খুঁড়েছিল। আমার মনে আছে, একজন নৌ-বাহিনীর গোয়েন্দা অফিসার আমাকে বলেছিলেন ঃ 'কতগুলো নোংরা ইঁদুর না সরিয়ে একখানা পাথর সরাতে পারবেন না।' সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন নৌবাহিনীর অফিসারের উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'ঐ অফিসারের নামের ড্রসিয়ার অভিযোগপত্র ছাদ ছুঁই ছুঁই হয়েছে এবং এখনো জমা হচ্ছে।'

কিন্তু এ সকল ভালো কাজগুলো অসার পরিগণিত হলো যখন বর্তমান শাসকচক্র বুঝতে পারলেন যে, আইয়ুব খানের 'সংস্কারের দশকে' দুর্নীতি এমন এক দৃষ্টান্তের শিখরে পৌঁছেছে, সহজভাবে পরিচ্ছন্ন করতে গেলে সকল বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তম অংশকেই বাদ দিয়ে দিতে হয়। সেজন্য সিদ্ধান্ত হয়, শুধু বেসামরিক প্রশাসনের দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্তা গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সেই অনুযায়ী ৩০৩ জন আমলাকে অপসারণ করা

হলো (অপসারিত আমলাদের সংখ্যা সামরিক রাইফেলের বোরের সাথে তুল্য হওয়ায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পীদের প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগায়)।

সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এমন কি প্রভাবশালী নৌবাহিনী অফিসারদের স্পর্শ করা হলো না–তাঁরা নিশ্চিন্ত আনন্দে সময় কাটাতে লাগলেন। এই দুর্নীতি বিষয়ে এভাবে রফা হবার পর ইয়াহিয়া খান যে আইয়ুব খানের আমলের শেষের দিকে দুর্নীতি ঠিক যতটা প্রাদুর্ভূত হয়েছিল ততটা না হওয়া পর্যন্ত চোখ বুজে থাকবেন এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি রক্ষার এই হলো নমুনা।

সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে বলতে হয় যে, গত ছ'মাসের ঘটনাবলী সরকারের প্রশাসনিক আমূল পরিবর্তনের জন্য বাহ্যিকভাবে পদ্ধতির আমুল সংস্কারের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯৫৮ সালের তথাকথিত সংসদীয় সরকারের বাতিল করাটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। গণতন্ত্রের ভণ্ডামি আর কিছু না করুক, জনগণের আবেগ সন্তুষ্টিতে এবং জনপ্রতিনিধি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা দিতে পেরেছিল। এই অপসারণের ফলে জনগণকে তার প্রকৃত শোষকের মুখোমুখি দাঁড় করালো। অতএব নতুন শাসকচক্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, কোনো রকমের একটি সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করতেই হবে এবং জনগণের দৈনন্দিন বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য দেবার অধিকার দিতে হবে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তা করতে হবে। দেশের ২৩ বছরের জীবনে কোনো সাধারণ নির্বাচন না হওয়াটাকে জনগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। সরকারের জন্য এটা ছিল দুরূহ সমস্যা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী উৎস। কাজেই ইয়াহিয়া খান ধূর্ততার সঙ্গে নির্বাচন দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি তাঁর এ ব্যাপারে আন্তরিকতায় বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত তৃতীয় প্রতিশ্রুতি, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত যে, প্রেসিডেন্ট কোনোক্রমেই তার বক্তব্যের সঙ্গে আন্তরিক ছিলেন না।

ইয়াহিয়া খান সম্ভবত অন্যদের চেয়ে ভালোভাবেই জানতেন যে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থাকার জন্য এসেছে এবং সেভাবেই তাঁকে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে। কার্যতঃ তাঁর সকল কর্মসূচি সেভাবেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েছিল। তিনি পৃষ্ঠপোষকতায় উদার এবং মহানুভবতার সাথে রাজনৈতিক পোশাক বদল করবেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন তাঁদের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করবেন কিন্তু তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন না। আমি এ ব্যাপারে আমার সহকর্মীদের সাবধান করেছি এমনকি বাজি ধরতেও রাজি যদি আমাকে দেশত্যাগ করতে না হয়। ঘটনাবলী এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সত্যিকারভাবে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা প্রেসিডেন্টের কোনো ইচ্ছা ছিল না। শুধু বেসামরিক সরকারের কাছে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে নেপথ্যে সামরিক পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার চাবুক হাতে নিয়ে তিনিই ক্ষমতায় থাকবেন।

তাঁর এই কৌশল সম্বন্ধে আমার একজন সামরিক বন্ধু বললেন, "ইয়াহিয়া খান নির্বোধ নন। তিনি সংগ্রাম না করে নির্বিঘ্নে আরামে ক্ষমতার সংকট চালাবেন। তাঁর এ কাজের জন্য তিনি বেশ কিছু লালচুলো গাধাও সংগ্রহ করবেন। আপনি দেখে নেবেন,

এসবের নাচের ব্যবস্থাও তাঁকে করে দেখাবেন।" এটা ছিল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের কথা। এ সময়ের মধ্যে চমক ভাঙ্গতে শুরু করেছে–কিছু লোকের কাছে প্রভাতী আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো–কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে তাদের সংসদ ও জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলেও–সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সামরিকচক্রের হাতেই থেকে যাবে। তাঁদের এই কাঠামো মোতাবেক নাহলে কোনো সংবিধানই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জেনেছি, রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে প্রথম থেকেই এ ধরনের একটি সমঝোতা হয়ে আছে। 'জাতীয় স্বার্থ' এটা ছিল যথারীতি একটা অজুহাত।

প্রেসিডেন্ট এ ধরনের বিধানের আবশ্যকতা এবং তাঁর এই পদের পূর্বসূরিদের পরার্থতা ধার করে নিজের বিবেকের কাছে যথার্থতা বোঝাতে পারতেন। ২২ বছর ধরে ক্রমাগত জনগণের কানে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনীতিকরা অবিশ্বাসী। সামরিক বাহিনী জনগণকে তাদের বাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার করার যেকোনো সংবিধানের চেয়েও তাদের ঐতিহ্যগত মহত্তর দায়িত্ব পালনে রয়েছে। কালো যে কালোই তা কুচকুচে কালো নাহলেও কালো। এ সময়ে এমনকি নিন্দুক বা কলঙ্ক প্রণেতারাও এসবে বিশ্বাস করতে লাগলো। ইয়াহিয়া খান এই কুটিল সমাজে জাত ও গোষ্ঠির অপরিশীলিত পণ্য, তিনিও এ ধরনের কুচকানো বিকৃত মানসিকতা মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং যখন তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদা করেছিলেন তখন তিনি গ্রহণীয় সংরক্ষণগুলো ধরে নিয়েই ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝেছিলেন। দৃশ্যতঃ এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রটি ছিল অন্যত্র। জাতির কাছে ওয়াদা করেছিলেন তিনি, যেহেতু ওসব ওয়াদা করতেই হয়, নাহলে নতুন শাসকচক্রের স্থায়িত্ব যে দীর্ঘ হয় না। পরে অবশ্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে এসবের অর্থের যথার্থ আচ্ছাদন দিতে। এভাবেই 'নব সূচনা'র পুরাতন প্রত্যাবর্তন হলো। আর আরেকটি বিশ্বাসঘাতকতা ঠিক পা বাড়ানোর দূরত্বেই রয়েছে।

১৯৭০ : নির্বাচন-পূর্ব টালবাহানা

পশ্চিম বা পূর্ব পাকিস্তানের কোনো একক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে আবির্ভাবের সম্ভাবনা নেই।
পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের একক দলভুক্ত হয়ে মুখোমুখি হবার প্রশ্নই নেই, যদি তা ঘটে তাহলে এর পরিণতি হবে পাকিস্তানের বিলুপ্তি।

–প্রফেসর জি. ডব্লিউ. চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের শাসনতান্ত্রিক বেসরকারি উপদেষ্টা
লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

শুরু থেকে যাই ঘটে থাকুক, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওয়াদা মোতাবেক জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বা পদ ছেড়ে দেবার কোনো ইচ্ছাই তিনি পোষণ করেননি। এপ্রিল ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রশ্ন ছিল জনমনে আঘাত না হেনে কীভাবে মতলব হাসিল করা যায়। আইয়ুব খানের পতন থেকে এ শিক্ষা গভীরভাবে তাঁর কাছে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এবার তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, শুরুতে স্বৈরতন্ত্রের রূপ জাহির করা হবে না। সাধারণ নির্বাচন যতই অপ্রিয় হোক, তবু তা প্রয়োজনীয় কারণে গিলতে হবে। নির্বাচন অস্বীকৃতি দেশ আর মেনে নেবে না। কিংবা বিগত নির্বাচনগুলোর মতো নির্বাচনী প্রহসনের পুনরাবৃত্তি জনগণ আর গ্রহণ করবে না। এ ব্যাপারে এটা মুখ্য হয়ে দাঁড়াল যে জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার করা হচ্ছে তা বোঝাতে হবে।

সুতরাং প্রেসিডেন্টের দৃশ্যতঃ তাঁর কাছে মনঃপুত হলো যে সামনে গণতন্ত্রের বিভ্রান্তিকর রূপের নেপথ্যে ক্ষমতা ধরে রাখবার ছদ্মবেশের নৈপুণ্য, এবারের কৌশল বলে ঠিক করা হলো। এটা জনপ্রতিবাদ ও শাসকচক্রের ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয় বৈধতা দিতে নিরোধ (বাটার) হিসেবে কাজ করবে। ইয়াহিয়া খান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্ষমতা অধিগ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাথা ঘামাতে (তেজারতি) শুরু করলেন। রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে তিনি ব্যবস্থা নিলেন। তিনি এক চতুর কৌশল শীঘ্র বের করলেন, যা জনগণের অনুমোদন অর্জনে এবং কার্যতঃ ক্ষমতা তার হাতের মুঠোয় থাকার নিশ্চয়তা দেবে।

এটা ছিল বিস্ময়কর এবং সহজ সূত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতে হলো যে, জনসংযোগের কারণেই নির্বাচনের ফলাফল শাসকচক্র বিকৃত করতে পারলো না। সেই কারণে শাসকগোষ্ঠী শাসনতন্ত্রের কাঠামো আগেই ঠিক করে দেবেন যাতে ইয়াহিয়া খানের নিজের অবস্থানে কোনো স্পর্শই লাগবে না। ব্যাপারটা দাঁড়ালো, যা কেউ কখনো আশা করে না, যেমন ভোজ পর্ব শেষ হওয়ার পরে খাসি জবাই দেওয়ার মতো।

কৌশলটা জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার মোক্ষম চেষ্টা। স্থানীয় রাজনৈতিক মতভেদ ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে বাধ্য করা হলো। ইয়াহিয়া খানের এটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, নির্বাচন মণ্ডলীদের মত প্রকাশে পূর্ণ সুযোগ দিলেও একটি দলের ছত্রছায়ায় তারা ঐক্যবদ্ধ হতে কখনো পারবে না। বরং এদের পরিত্যাগ করে পরিষদের বিপরীতমুখীদের ব্যাপক হারে ভোট দেবে। যাদেরকে তিনি পরবর্তীকালে যথেচ্ছ ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করা তার পক্ষে সহজ হবে। তা' হলেই তিনি পারস্পরিক মতৈক্যের অভাব দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান তৈরি করতে পারবেন। তিনি যদি এই অনিশ্চয়তাকে নিশ্চিতকরণ করতে পারেন তাহলে তিনি সুস্থভাবে ক্ষমতার শীর্ষেই থাকবেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার কারণও ছিল। আইয়ুব খানের পতন ঘটানোর জন্য সমগ্র দেশ ও দেশের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু বিকল্প সরকার পদ্ধতির ঐকমত্যে পৌঁছতে আজ ব্যর্থ হয়েছেন। এ কারণেই শুরু থেকে ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের জুতোয় হাঁটতে শুরু করলেন। পাঞ্জাবী শাসকচক্রের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাই যে, দেশজুড়ে অস্থিরতার আসল কারণ সেসব কথা আগে উল্লেখ করেছি। এটা বহুকাল ধরে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ছাঁচ দ্বারা দেশকে বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ দোষমুক্ত ছিলেন না। দেয়াল তোলা আমলা-সামরিক গোষ্ঠীর হাতে ব্যবহৃত হোত না, যদি না অতটা অমনোযোগী কিংবা কম বিনয়ীভাব দেখাতেন। তাঁরা এসবের কোনোটাই ছিলেন না। লোলুপতার শৃংখলে তারা বাধা পড়ে গিয়েছিলেন। সে কারণেই রাজনৈতিক দল ভাঙ্গাগড়ার খেলা হয়েছে। কোনো কোনো সময় তিন সদস্য নিয়েও দল হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, সম্পাদক রূপে তার অফিস কর্মী এবং ধনী চাচা কোষাধ্যক্ষ রূপে। কোনো একটি স্মরণীয় ঘটনায়, এই অদ্ভুত রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা এক করুণ পরিণতিতে পৌঁছে যান যখন নির্বাহী নিম্নস্তরের পদ থেকেও তাঁকে বাদ দেয়া হয়। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হননি। তেমনি, তাঁর গতিপথ অন্যদিকে সরিয়ে বাকী ক'মাসের মধ্যেই তিনি নতুন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করলেন। নির্বাচনের পদ্ধতি দলের মতে, শুধু ভাঙ্গনেরই সৃষ্টি করে। ১৯৬৯ সালে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও উপদল নির্বাচন সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। এটা অস্বাভাবিক নয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই অবস্থা দেখে তাঁর প্রতারণার উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ইয়াহিয়া খান যখন তিনি তাঁর অভিযান শুরু করলেন, তখন তিনি পূর্ব বাংলার যে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বিগত দু'দশকের ঔপনিবেশিক শোষণের থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং নির্বাচনের সময়ে তা সামুদ্রিক জল বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়বে তিনি তা' ভাবতে পারেননি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ভিত্তি গেল পাল্টে। এটা উপলব্ধি করে তার অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা মহাভুলের পথে এগিয়ে গেল। সে সময় দাবার ঘুঁটিগুলোর অবস্থানও ছিল সুন্দর এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ইয়াহিয়া খানকে এ খেলায় ঝাঁপ দিতে উৎসাহিত করলো। দাবার চালও তেমনি চালা হলো। এতে আত্মবিশ্বাসী ও উদ্দীপনাও গেল বেড়ে।

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে রেডিও এবং টেলিভিশনে বহুল প্রচারিত ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, 'গত সাত মাস ধরে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখলেন, নেতাদের সাথে কথা বললেন, এবং এখন তিনি জাতিকে তার আস্থায় আনতে পেরেছেন।' তবে তিনি দুঃখের সাথে বললেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে কোনো আনুষ্ঠানিক ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়নি। তথাপি তিনি দাবি করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের মতামত সম্পর্কে তিনি সচেতন। সে কারণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিতে প্রয়োজন বোধ করছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আইনগত কাঠামোসহ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তিনি বোধ করছেন। এটা তিনি পরে জানাবেন। দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক প্রশ্নে বিশেষতঃ সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকার, আইন প্রয়োগকারী ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রে ইসলামী রূপ এসব প্রশ্নে তিনি কোনো মতানৈক্য দেখতে পাননি। সে কারণে নতুন শাসনতন্ত্রে এসব প্রশ্ন মীমাংসিত বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত, তিনি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা করছেন। তিনটির সাংবিধানিক সমস্যার মাঝে দুটো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন। তার মধ্যে একটি হলো, এক ইউনিট প্রথমে বাতিল করা, যা পশ্চিম পাকিস্তানকে স্বতন্ত্রভাবে সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। আর অন্যটি হলো প্যারেটি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সমান প্রতিনিধিত্ব। সেজন্য ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রূপে পরিণত হবে এবং এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন ও সংবিধানের অংশ হিসেবে সংখ্যা সাম্যের পরিবর্তিত নীতি হিসেবে গৃহীত হবে। শাসনতন্ত্রের সমস্যাবলীর মীমাংসা হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট তৃতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সম্পর্কেও কেন্দ্রের সঙ্গে (প্রদেশ) সম্পর্ক বিষয়ে সমাধান দিতে পারতেন, তাতে দেশ একটা তৈরি করা 'সংবিধান' পেয়ে যেত। কিন্তু তিনি উদারতা দেখিয়ে এই সমস্যাটিকে জাতীয় পরিষদের জন্য রেখে দিলেন। যাতে "পরিষদ এই সমস্যার সমাধান এমনভাবে করেন যা সকল প্রদেশের বৈধ চাহিদা ও দাবি পূরণে তথা সামগ্রিকভাবে জাতির প্রধান চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।" ইয়াহিয়া খান তারপর জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হবে। ৩১ মার্চের মধ্যে আইনগত কাঠামো, জুনমাসের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে। নতুন পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধান প্রণয়নের পর প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইয়াহিয়া খান যদিও একথা বলেননি তবুও, সাধারণত লোকের একটা ধারণা হয়েছিল যে ১৯৭১ সালে মার্চ কিংবা এপ্রিল অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাস পরেই তারা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছেন। মার্চের ঘোষণার মতো প্রেসিডেন্টের রেডিও ভাষণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই তৈরি করা হয়েছিল। এতে আশানুরূপ সাড়াও মিলেছিল।

১৯৫৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তান একীকরণ করে যখন এক ইউনিট গঠন করা হলো তা ছিল পাঞ্জাবী আকাঙ্ক্ষাকে আয়াসলব্ধ করার অন্য সকল অঞ্চলের জন্য তা ছিল সপুঁজ ক্ষত। বিগত ১৪ বছর ধরে সিন্ধি, বেলুচি, পাঠানরা একীকরণ প্রাদেশিক কাঠামোতে পাঞ্জাবী আধিপত্যের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে। সে কারণে নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

অন্য অংশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ সবচেয়ে বেশি সন্তোষ জানিয়ে ছিল যে প্রেসিডেন্ট মহানুভবতা দেখিয়ে প্যারেটি বা সংখ্যাসাম্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর 'একজনের এক ভোট' নীতি মত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের তথা এ প্রদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ অধিকার লাভের সুযোগ দিয়েছিল। এ অপ্রত্যাশিত বোনাসে সকলেই উল্লসিত হলো। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জনগণ আনন্দিত হয়েছিল, এটুকু জেনে যে সাধারণ নির্বাচন ও আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অন্ততঃ একটা তারিখ নির্দিষ্ট হলো।

উল্লসিত জনগণ পরিষদের সংবিধান প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ও ইয়াহিয়া খানের মীমাংসিত সমস্যাবলির ঘোষণার ক্ষমতা হ্রাস করার কথায় মোটেই উদ্বিগ্ন হয়নি। এমনকি প্রেসিডেন্ট যে আইনগত কাঠামো ও ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের যে আদেশ জারি করেছেন সেসব নিয়েও জনগণকে কোনো রকম উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি। নতুন পরিষদের ভোটের পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতো উত্তেজনাময় সমস্যা পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যদি সেটা আশা করা যায় পরিষদ ছোট ছোট দল দ্বারা গঠিত হয়। জনগণ এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়া এবং একজনের এক ভোট ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের আশায় বিভোর ছিল। এবং অন্যান্য বিষয়ে একটা দ্রুত সমঝোতায় পৌঁছে যাবে এটা সকলেই ধরে নিয়েছিল। ইয়াহিয়া খান এক হাতে গাজর এবং চতুরভাবে অন্য হাতে চাবুক লুকিয়ে রেখেছিলেন।

চার মাস পরে যখন আইনগত কাঠামো আদেশ প্রকাশিত হলো তখনই অনুভূত হলো আসল সমস্যা। কৌতূহলোদ্দীপক সামঞ্জস্য রক্ষা করে ঘটনাটি ঘটেছিল এপ্রিল ফুলের দিনে। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনার নজির অজস্র মিলবে।

আইনগত কাঠামো আদেশে (এল এফ ও) যে ইয়াহিয়া খানের দুরভিসন্ধি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান বিলকে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে বাধ্য

থাকিবে। প্রেসিডেন্ট যদি সংবিধান বিল অনুমোদন না করেন তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"

২৭নং অনুচ্ছেদের রায় হলো ঃ (১) এই আদেশের যেকোনো শর্তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ দেখা দিলে তাহা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মীমাংসিত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে চূড়ান্ত এবং তাহা কোনো আদালতে উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

(২) এই আদেশের যেকোনো সংশোধনীয় ক্ষমতা থাকিবে প্রেসিডেন্টের হাতে; পরিষদের হাতে নয়।

এই আদেশ অনুযায়ী পরিষদের সদস্যগণ নির্ধারিত শপথ গ্রহণে বাধ্য থাকিবেন। শপথ নামায় অন্যান্য কথার মধ্যে "১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশের শর্তাবলী এবং সেই আদেশ বিধৃত পরিষদের আইন ও বিধি অনুযায়ী বিশ্বস্ততার সহিত" কর্তব্য পালনের কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

এই আদেশে সমান উপযোগিতার ওপর দৃঢ়ভাবে পাঁচটি মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। ২০নং অনুচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে বিধৃত হয়েছে। সংবিধান এমনভাবে প্রণীত হইবে, যাহাতে নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য থাকিবে।

১। পাকিস্তানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হইবে যাহা ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান নামে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইবে তাহা ঐ নামে পরিচিত হইবে। ইহাতে প্রদেশগুলো ও অন্যান্য অঞ্চলে বর্তমান অবস্থান ও যুক্তরাষ্ট্রে এমনভাবে মিলিত হইবে যেন স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা কোনোমতে দুর্বল না হয়।

২। (ক) ইসলামী জীবনাদর্শ, যাহা পাকিস্তানের সৃষ্টির মূল ভিত্তি তাহা অবশ্যই রক্ষিত হইতে হইবে। (খ) রাষ্ট্রপ্রধানকে একজন মুসলমান হইতে হইবে।

৩। (ক) জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে প্রত্যক্ষ ও অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থার পর্যাবৃত্তের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। (খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইবে এবং সেইগুলি মানিয়া চলিতে বিধান রাখিতে হইবে। (গ) ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার নির্বাচন নিশ্চিত করণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ আইনের শাসন নিশ্চিত করিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকিতে হইবে।

৪। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক যাবতীয় ক্ষমতা এমনভাবে বন্টন করিতে হইবে যাহাতে প্রদেশগুলোর সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যথেষ্ট

ক্ষমতা থাকিতে হইবে। যাহাতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্বন্ধীয় দায়িত্ব পালনে এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সমর্থ হয়।

৫। (ক) ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, পাকিস্তানের সব অঞ্চলের জনসাধারণ যাহাতে পূর্ণাঙ্গভাবে সকল প্রকারের জাতীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণ করিতে পারে। (খ) একটি সুনির্দিষ্টকালে যাহাতে সকল প্রদেশগুলোর এবং প্রাদেশিক বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যেকার আর্থিক ও অন্যান্য বৈষম্য সাংবিধানিক আইন ও অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

আমি আইনগত কাঠামো আদেশ থেকে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছি কেননা এতে জড়িয়ে থাকা অন্তর বেদনা স্পষ্ট হয়।

যাহোক শেষ কথা হলো, নির্বাচিত সদস্যগণ যতই খোশ খেয়ালে বুঁদ হন না কেন, জাতীয় পরিষদ কিছুতেই একটি সার্বভৌম সংস্থা হবে না। এটা হবে প্রেসিডেন্টের খেয়াল খুশিমতো একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এই খেয়ালকে ইয়াহিয়া খান সুবিধামতো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং সংবিধান প্রণয়নের প্রথম ও চতুর্থ নীতির পরস্পর বিরোধী শর্তের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান সুকৌশলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন। একদিকে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা, অপরদিকে বিপরীত শর্ত জুড়ে উত্থাপিত হয়েছে প্রদেশগুলো পাবে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণে আইন প্রণয়নী, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা। মোদ্দা কথা হলো, একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে সর্বাধিক পরিমাণে আইন প্রণয়নী প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, যাতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারে। কাউকে এ ধরনের ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণের অসঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করতে অভিধান চর্চার প্রয়োজন হবে না।

প্রাদেশিক এবং ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনৈতিক পরিবেশ ইতোমধ্যেই যেভাবে তিক্ততায় দূষিত হয়েছে তাতে ইয়াহিয়া খান একটা রাজনৈতিক মোচড় দিতে চেয়েছিলেন, যা পাকিস্তানের কুণ্ডলি পাকানো রাজনীতিকে আরও অসম্ভব করে তোলে। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহ স্ব স্ব কর্মসূচির যথার্থতা প্রমাণের জন্য ৪নং নীতির যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু পরিষদের অভ্যন্তরে ভালোভাবে অচলাবস্থা নিশ্চিত করা যাবে না। এমতাবস্থায় জনগণের সব সময়ের বন্ধু ও রক্ষক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলবেন, জাতীয় স্বার্থ ওটা চায় না, চায় এটা, এটা–এই মতলবে তিনি আইনগত কাঠামোর ব্যাখ্যা দানের সর্বময় সফলতা সুনির্দিষ্টভাবে নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। এমনকি দৃশ্যতঃ অসম্ভব ঘটনার ফলে পরিষদ যদি বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ওঠতে পারেও তথাপি সংবিধান বিল যদি তার পরিকল্পনার ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ না হয়, তা হলে তিনি তার সম্মতি দান স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

অনুপকারী হবে না বলে যা এক সময় মনে করা হয়েছিল, সেই আইনগত কাঠামোর সামগ্রিক ফলাফল হলো ধাঁধা লাগানো, ইয়াহিয়া খান সবশেষে তাঁর দাঁত দেখালেন।

ইতোমধ্যে প্রতিবাদের দেরি হয়ে গেছে। নববর্ষের দিনে রাজনীতি শুরু হলে পুরনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের নতুন জীবন পেল। রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হলে শাসকচক্র এটাকে রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতার প্রমাণ স্বরূপ নিন্দা জ্ঞাপন করতে দেরি করেনি। জনসাধারণের মনে তাদের ভাবী নেতৃবৃন্দের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করলো। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া খান বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবাবলী পেশ করলেন। যা ছিল সকলের প্রশ্ন অথবা কারোই না।

জনগণের বোকামি আবার সর্বনাশের কারণ বলে প্রমাণিত হলো। রাজনীতিবিদেরা তাঁদের ভূমিকার জন্য দেখতে পেলেন নির্বাচন এবং মন্ত্রিত্বের আশা। তাদের এসবের লোভ সামলানো দায়। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো এই জ্বালাতন সহ্য করে, আমলাতান্ত্রিক সামরিক অক্টোপাশের বিরুদ্ধে তাঁদের নিজেদের অধিকার অর্জনের উত্তম সুযোগের প্রত্যাশা করলেন।

অন্ততঃ আওয়ামী লীগের জন্য এটা সুদূর পরাহত ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান আগেই নির্ভুলভাবে অনুমান করেছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নের কাজে প্রধান বাধা আসবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পশ্চিমের স্বদেশবাসীদের তুলনায় সেখানকার জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিক সচেতন ছিলেন। দুই যুগেরও অধিককাল ধরে শোষিত হওয়ার পর তারাও সরকারি কর্তৃত্ব লাভের বিষয়ে সন্দিহান। সুতরাং সন্দেহমুক্ত করতে তিনি সুচতুর চাল চাললেন, যদি তাদের মন জয় করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায়।

কৌশলটি ছিল সরল অথচ যথেষ্ট ফলদায়ক। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের উচ্চ পদে কয়েকজন বাঙালি অন্তর্ভুক্ত করে এদের চেহারা পাল্টে দিলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আগে যেখানে দুই বা তিনজন বাঙালি সচিব ছিলেন, স্বল্পকালের মধ্যে তাদের সংখ্যা তিনজন বৃদ্ধি পেল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে, পরিকল্পনা কমিশনে, সরকারি কর্পোরেশনগুলোতে, পাকিস্তানি দূতাবাসে এবং সরকারি বেতার ও টেলিভিশনের চাকুরীতেও বাঙালিদের প্রবেশ ঘটতে লাগলো।

বিদেশে সরকারি প্রতিনিধিত্বে বাঙালিরা প্রাধান্য পেল। পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ সকলে বাঙালি না হয়েও প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী ও বৈদেশিক ভোজসভায় অগ্রাধিকার পেলেন। এ সম্প্রসারিত কার্যক্রমের সঙ্গে প্রচারের মাত্রাও গেল বেড়ে। তারপর নৌবাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। এই ভদ্র ও যোগ্য অফিসার কয়েক বছরের জন্য এই প্রদেশের নৌ-পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময় তাঁর নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার জন্য সামাজিক সুনামের যথাযোগ্য সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালিদের প্রিয়। বাঙালিরা তাঁর নিয়োগকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সর্বোপরি ছিল বাঙালিদের জন্য ইয়াহিয়া খানের দরদ প্রকাশের পুনরুক্তি। ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই তারিখে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কার্যক্রমের কোনো কোনো

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ না পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানিরা যে অবহেলিত, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সেনাবিভাগে বাঙালিদের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা এখন থেকে দ্বিগুণ করা হবে এবং দেশরক্ষা বাহিনীগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি চলতেই থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এ সমস্ত ঘটনা বাঙালিদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক লোকের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও বাঙালিরা এগুলোকে লুফে নিল। শাসকবর্গ অতীতে কখনো তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি।

তারপর আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বাঙালিদের সন্দেহ নিরসনার্থে ইয়াহিয়া খান নিজেকে আরো এগিয়ে নিলেন। প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাসাম্যনীতি বাতিলকরণ এ সমস্ত কৌশলের মধ্যে তখন কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল এবং সর্বনাশের মূল বলে প্রমাণিত হলো।

যদিও দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগের বিষয় হলেও সংখ্যাসাম্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল না। আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচিতে কিংবা বাঙালি ছাত্রদের ১১ দফা দাবিতে এটা ছিল না। এটাকে সহজেই মীমাংসিত সমস্যাবলীর শ্রেণিভুক্ত করা যেতো। তখন বাঙালিরা এই সংখ্যাসাম্যনীতিকে সর্বনাশের কারণ বলে দাবি করেনি। কিন্তু তাদের দাবি ছিল ব্যাপক অর্থে এই মূল চুক্তির আশু বাস্তবায়ন অর্থাৎ বেসামরিক চাকুরি ও সামরিক বাহিনীতে সমান প্রতিনিধিত্ব দান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য অপসারণ যা পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। তোষণের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্মপন্থা হিসেবে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মীমাংসা না করে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া খান বাঙালি অসন্তোষের সমাপ্তি ঘটালেন। যা এ পর্যন্ত আর কেউ করেনি।

আরো অনেকের কাছে এই বিপদ ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাজনীতিবিদ হিসেবে ইয়াহিয়া খান কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ব্যাপারটিকে সেদিক থেকে দেখেন নি। সম্ভবতঃ এটা ছিল নিজের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস।

'একজনের এক ভোট' নীতি জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে দিয়েছিল ১৬৯টি আসন এবং পরিষদে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা–এই নির্ধারিত রাজনৈতিক সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে হয়ে ওঠলো যেন স্বর্গ থেকে প্রেরিত একটি অমোঘ সুযোগ। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিকে 'ম্যাগনা কার্টার'-এর মতো অনুমোদন দেওয়া হলো এবং সাধারণ নির্বাচনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর গৃহীত গণভোটে পরিণত করা হলো। এর অপরিহার্য পরিণতি ইয়াহিয়া খানের অভিপ্রেত সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ছলনাশ্রয়ী করে তুললো।

সামরিকভাবে ক্ষমতা দখলের অভিপ্রেত কৌশল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। অভীষ্ট পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর স্বাভাবিক শান্তভাব হারিয়ে ফেললেন, তারপর

আর কোনোদিন তিনি শান্তভাব ফিরে পেলেন না। নিছক রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান হিসেবে পরবর্তীকালে যে হঠকারিতা ও বর্বরতার আশ্রয় নেওয়া হলো তা রাষ্ট্রের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু সেটা হলো ইতিহাসের আরেক অধ্যায়। ১৯৭০ সালের ১ এপ্রিল তারিখে সবকিছুই ঠিকমতো চলছিলো। ইয়াহিয়া খান আগত বিপর্যয়ের সংকেত না বুঝতে পেরে ক্ষমতার তুঙ্গে আরোহণ করলেন।

পাকিস্তানের মতো দেশে যেখানে বাকস্বাধীনতা নেই বললেই চলে। কোন বিষয় সম্পর্কে কথা বলার রীতির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় অকথিত বিষয়কে অধিকতর মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সাফল্য অনেক সময় নির্ভর করে কী বলতে হবে এবং কীভাবে বলতে হবে তার ওপর।

১৯৭০ সালে গ্রীষ্মকালে এবং নির্বাচনী অভিযানের দশম মাসে সবকিছুই মোটামুটিভাবে আশানুরূপ চলছিলো। তখন পর্যন্ত সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোনো অভিযোগ ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন পরস্পর পরস্পরের গলা কাটছিলেন আর প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়া-আসা করছিলেন। দেশের বড় বড় শহরে বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো। রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুঁড়ি করছিল। সে সঙ্গে হঠকারী তৎপরতা নির্বিঘ্নে চালানো হচ্ছিল।

যদিও শুধু সংবাদপত্রে সুষ্ঠুভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছিলো যে, প্রেসিডেন্টের জামার আস্তিনে একটি তাসের টেক্কা লুকানো রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক গতিবিধি ও সংবিধানের ভাগ্য সম্পর্কে জনগণের সংশয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তা উপযুক্ত সময়েই চালা হবে। নানা রকমের কাহিনী শোনা যাচ্ছিলো। তন্মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হয়েছিল তা হলো খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্যে প্রেসিডেন্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিকল্প কমিশন গঠন করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের মনে যে ফর্মূলা ছিল তা যেভাবেই উপস্থিত হোক না তাতে মূলভাবের অনুমান করা গিয়েছিল।

এসব যেভাবেই আসুক না কেন, এসবের উত্তর কিন্তু একই ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ ভারসাম্য, সামরিক বাহিনীর উদ্ভট কাজের জন্য তহবিলের নিশ্চয়তা, সর্বোপরি ক্ষমতার শীর্ষে প্রেসিডেন্টের নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থিতি। এসব আলোচিত হলো, প্রত্যাশিত রাজনৈতিক জটিলতা দৃষ্টিতে। পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তাতে এসব বিকল্প প্রস্তাবগুলো পরিষদে উপস্থাপিত হবে। তখন নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে সাংবিধানিক বাক-বিতণ্ডার সফল নিষ্পত্তির জন্য, এসব প্রস্তাবের আপোষ ফর্মূলা হিসেবে গ্রহণের জন্য পরিষদ সদস্যদের বাধ্য করা হবে।

যে সম্পাদক আমাকে এ খবর বললেন, তিনি কিন্তু তাঁর পত্রিকায় ছাপাতে সাহস পাননি। তিনি বিশ্বস্ত যাকেই পেয়েছেন তাঁর কাছেই গোপনে বলেছেন যে, তিনি ঘোড়ার মুখ থেকে সরাসরি এ খবর সংগ্রহ করেছেন। এই বিতর্কিত জন্তুটি বা

সূত্রটি প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টার চেয়ে কম কেউ ছিলেন না। রাওয়ালপিন্ডি, করাচি ও ঢাকার গুজব কারখানাগুলোতে তখন পুরোদমে গুজব ছড়ানো চলছিলো। জনমত এভাবে তৈরি করা হচ্ছিল যে আলোচিত বিষয়গুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

কোনো এক ধরনের জাদুর প্রয়োজন হবে। সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিলো, যেখানে বাজি ছাড়াই পণ্ডিতেরা বাজি ধরেছিলেন যে, ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে অনিবার্য মতানৈক্যের দরুন পরিষদ অচল হয়ে যাবে। কাজেই ইয়াহিয়া খানের লুকানো তাসের টেক্কার প্রকৃত স্বরূপ কী নিম্নের সমস্ত জল্পনা কল্পনায় তা কেন্দ্রীভূত হলো।

তখন পূর্ব বাংলার যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দৃশ্য সূক্ষ্মভাবে দেখনো হচ্ছিলো, পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন উদ্বেগ দেখা দেয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক তাঁর দলের কর্মসূচিতে নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করার আবেদনে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। লক্ষণীয়, অনেক চরমপন্থী যাঁরা শেখ মুজিবের দক্ষিণঘেঁষা মধ্যপন্থার নীতি হজম করতে পারতেন না তাঁরাও নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। এহেন অবস্থার অগ্রগতি সদাপর্যবেক্ষণকারী সরকারি কর্তৃপক্ষকে অকারণে উদ্বিগ্ন করেছে বলে মনে হয়নি। ক্ষমতার শীর্ষে ইয়াহিয়া খান আগের মতই আত্মবিশ্বাসী, আপাতঃদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছিল।

উল্লেখ্য মজার বিষয় হলো এই যে, প্রেসিডেন্টের সংস্থাপনের নীচতলায় তখন একদল জান্তা কাজ করছিলো। পাঁচজন সেনানায়ক ও দু'জন অসামরিক ব্যক্তির সমন্বয়ে এ 'সেল' গঠিত হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ছিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদ খান, প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার ও কার্যতঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য লেঃ জেনারেল পীরজাদা। বছর খানেক পরে বাংলাদেশের কসাইরূপে খ্যাত লেঃ জেনারেল টিক্কা খান, আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল আকবর খান এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ওমর খান। এদের সবারই ছিলো প্রেসিডেন্টের কাছে অবাধ প্রবেশাধিকার। দু'জন বেসামরিক অফিসারও ছিলেন। এদের একজন হলেন অসামরিক গোয়েন্দা দফতরের পরিচালক রিজভী, অন্যজন হলেন প্রেসিডেন্টের আর্থনীতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমদ।

অভ্যন্তরীণ চক্রের এসব ভদ্রলোকদের সমন্বয়ে প্রেসিডেন্টের একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, যারা অবিসংবাদিতরূপে প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। এঁরা প্রতিটি ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এঁদের ছিল না। আমি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, প্রথম দিকে এসবের ওপর গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টকে গুরুত্ব দেয়া হতো না। পূর্ব বাংলার কয়েকজন সংবাদদাতাকে শেখ মুজিবের

প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে সহানুভূতিশীলতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো এবং তাদের অবিশ্বাসীদের শ্রেণিভুক্ত করা হলো।

পূর্ব বাংলার অসংখ্য মসজিদে মোল্লাগণ জামায়াতে ইসলামীর লাগামহীন ভণ্ডামির পক্ষে কর্কশ ভাষায় যে অভিযান চালাচ্ছিলো, তা শাসন কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে উৎসাহিত করছিল। এর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গর্জন (ভোটের বাক্সে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো) এই উৎসাহকে আরো জোরদার করলো। সামরিকচক্রের মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেখ মুজিবের দলের সাফল্যের দৌড় পৌছবে এক তৃতীয়াংশের মতো সম্ভবতঃ তিনি সব মহল থেকে সঠিক সহযোগিতা পাবেন না।

এরূপ বিশ্বাস ছিল, প্রাপ্ত প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার নিজের ১৯৭০ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে ধারণা হলো যে আওয়ামী লীগ সহজেই বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হবে। আমি ১২২টি আসনে কোনো প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে পাইনি। বাকী ৪০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ যুক্তিসঙ্গতভাবে কমপক্ষে অর্ধেক আসল লাভের আশা করতে পারে। ফলে আশা করেছিলাম এই দল কমপক্ষে ১৪২টি আসন পাবে। এটা ছিল প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মারাত্মক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কয়েকদিন আগেকার ধারণা।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় শেষ আশাটুকু উবে গেল বলে প্রমাণিত হলো। বিশ্বের সকল দেশ থেকে যখন সাহায্য আসতে লাগলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি সহানুভূতিসূচক বাণীও শোনা গেল না। তখন সেখানে পরিবেশ যেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও সমাজের সুন্দরী নারীর মধ্যেকার যৌন-অপরাধ ও আত্মহত্যার কলংকের মতোই মনে হয়েছে। যা নতুন মাত্রায় বাঙালি অসন্তোষের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুললো। বাঙালিদের মনে স্পষ্টরূপে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে তারা দেশের অপর অংশের ভাইদের কাছ থেকে সদাচরণের আশা করতে পারে না। কাজেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ওপর নির্বাচনকে প্রকৃতপক্ষে গণভোটে পরিণত করেছিলেন। এই ফলাফল হলো ভয়াবহ।

তথাপি একথা কৌতূহলজনকভাবে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের গতি রুদ্ধ হবে বলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতাসীনরা আশা পোষণ করেছিলেন। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের ফলাফল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সম্বন্ধে আমাকে বলা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

আওয়ামী লীগ	৮০
কাইয়ূমপন্থী মুসলিম লীগ	৭০
মুসলিম লীগ (দৌলতানা গ্রুপ)	৪০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ)	৩৫
ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি	২৫

এটা যে কত বড় ভুল হিসেব ছিল, সম্ভবতঃ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারিগণ অভীষ্ট ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করে উদ্ভাবন করেছিলেন বা এতে ছিল বিদ্বেষমূলক রহস্য? দ্বিতীয় ধারণার প্রতিই আমি বিশ্বাসী।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বেসরকারি শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা অধ্যাপক জি. ডব্লিউ. চৌধুরীর ১৯৭০ সালের ১০ সেপ্টেম্বরে লন্ডনস্থ পাকিস্তান সোসাইটিতে প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এটি ছিল পূর্বাঞ্চলের মারাত্মক বন্যার জন্য নির্বাচনের তারিখ ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখার কয়েকদিন পরের ঘটনা। অধ্যাপক চৌধুরী পাকিস্তানের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং ভাষণের পরে শ্রোতাদের ভিড়ে প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়েছিলেন। সোসাইটির বুলেটিনে (৩১তম সংখ্যার ৪৬-৫৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত তার কিছু অংশকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হলো এই ঃ

কর্নেল জি. এল. হাইড ঃ 'একজনের এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই জাতীয় পরিষদ কী পূর্ব পাকিস্তান থেকে অধিক সংখ্যক লাভ করবে?

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ হ্যাঁ।

কর্নেল হাইড ঃ তার অর্থ কী? এই যে পূর্ব পাকিস্তান সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ হ্যাঁ, যদি কেউ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাহলে একজনের এক ভোট নীতিকে গ্রহণ করতেই হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান বলে কোনোকিছু থাকবে না। অবশ্য দলের ভিত্তিতে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। তবে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন আমরা আশা করি এই সাধারণ পার্থক্য থাকবে না। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের একটি মাত্র দলে সংঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতার মোকাবেলা করার প্রশ্নই উঠেনা। যদি তাই হয় তাহলে এর অর্থ হবে পাকিস্তানের বিলুপ্তি এবং আমরা পুরোপুরি আশাবাদী যে এমন অবস্থা কখনই ঘটবে না।

মিঃ আযম ঃ অবস্থা যদি এমন হয় যে প্রতিটি ব্যাপারই পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিতে মীমাংসিত হচ্ছে, তাহলে এক্ষেত্রে সরকার কী কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন?

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ এটা কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মিঃ আযম ঃ এমতাবস্থায় সরকার কী করবেন এবং বলবেন নাকি 'তোমরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছতে পারনি সুতরাং আমাদের নতুন নির্বাচনে ফিরে যেতে হবে।'

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে, পশ্চিম কিংবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি আশাবাদী যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেবে না।

অধ্যাপক চৌধুরীর মন্তব্য থেকে তিনটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্টরূপে দেখা দেয় ঃ

(১) পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একই কণ্ঠে জনরায় দেয়, তা পশ্চিম পাকিস্তান সেই গণরায় গ্রহণ করবে না।

(২) যদি সেরূপ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে রাষ্ট্রের সর্বনাশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তান তা প্রতিরোধ করবে।

(৩) তাঁর বিবৃতি থেকে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই যে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, শেষের দিকে সরকার সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তখন সরকার সরলভাবে বুড়ো আঙুল মোচড়াচ্ছিলেন, আর পরিস্থিতির উন্নতি আশা করছিলেন।

প্রথম দুটি পয়েন্ট থেকে ব্যাখ্যা যা পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ "দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ" বা বাংলাদেশের ওপর নৃশংস বর্বরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রেসিডেন্টের মনে গণতন্ত্রের স্বরূপ কী ছিল? এবং বাংলাদেশে নৃশংস সামরিক কর্মব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে যে ম্যাকিয়াভেলি সুলভ মানসিক প্রবণতা বিরাজ করছিলো তা তলিয়ে দেখতে যারা অনিচ্ছুক ছিলেন এই ঘটনা তাদের চোখ খুলে দেবে।

অধ্যাপক চৌধুরীর তৃতীয় মত মেনে নিতে পারছিনা বলে আমি দুঃখিত। যোগ্য গোয়েদা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের পূর্বে সরকার বাঙালি অনুভূতির তীব্র প্রবণতা সম্পর্কে অপরাধীর ন্যায় নির্বোধ ছিল। কিংবা অবিশ্বাস্যরূপে অন্ধ ছিল। একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শাসকগোষ্ঠী সূচনায় এর ভুল হিসাবের কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক থাকতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাক্ষ্য প্রমাণের স্তূপ এত বিরাট হয়েছিল যে, নির্বোধ এবং অন্ধরাও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সরকার নির্বোধ কিংবা অন্ধ কোনোটাই ছিল না। বস্তুতঃ সরকার বিপদের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তা প্রতিরোধ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ভালভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে প্রশাসনিক ভাঙন কিংবা এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিনিধিরা বাকপটুতার সঙ্গে তাদের শাসকগোষ্ঠীকে যে ওয়াদা করেছিল তার উপস্থাপনের ব্যর্থতাই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

নির্বাচনী অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি প্রতারণার নিদর্শনও যথেষ্ট ছিল। কোনো কোন মন্ত্রী প্রকাশ্যেই তাঁদের উদ্দেশ্যপূর্ণ নির্বাচনী তৎপরতা দেখিয়েছেন। কোন কোনো দল বা প্রার্থীর অনুকূলে তাঁরা চাঁদা তুলেছেন। সামরিক জান্তার জনৈক সদস্য মাত্র এক সফরেই শিল্পপতিদের কাছ থেকে দেড় কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে বলে খবর রয়েছে। এই সংগৃহীত অর্থ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অভিযানকে উৎসাহিত করার কাজে ব্যয় হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিল যে, সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের এবং করাচি, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে প্রগতিবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে নির্বাচনের প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করছিল।

'সীমান্তগান্ধী' বলে সুপরিচিত খান আব্দুল গাফ্ফার খানের পুত্র ওয়ালী খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রভাব খর্ব করার জন্য কাইয়ূম খানকে সমর্থন করা হচ্ছিল। ওয়ালী খান কখনই সরকারের সুরের সঙ্গে নিজের সুর মেলাননি। সরকারের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন এমন একজন নেতা, যিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মতই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানের জনগণকে বিপজ্জনকভাবে পরিচালিত করছিলেন। বস্তুতঃ ওয়ালী শেখ মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থনের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

কাজেই ওয়ালী খানের ক্রমবর্ধমান শক্তি হ্রাস করার জন্যই কাইয়ূম খানের মুসলিম লীগকে সরকারের পক্ষ থেকে নির্লজ্জভাবে সাহায্য করা হচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারবিরোধী পক্ষের কেন্দ্রবিন্দু জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রভাব খর্ব করার জন্য জামায়াতে ইসলামীও তদ্রূপ সরকারি সমর্থন পেয়ে আসছিল। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের পক্ষ সমর্থন এবং ওয়ালী খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতার কাজে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো (যা ছিল প্রকাশ্যভাবে সরকারের হাতে তৈরি) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে লাগলো। সিন্ধুতে ভুট্টো বারবার অভিযোগ করছিলেন যে, তাঁর পেছনে গোয়েন্দা বিভাগকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণও একই ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিলেন।

সর্বোপরি রাওয়ালপিণ্ডি ও সামরিক হেডকোয়ার্টার থেকে এই মর্মে একটি প্রবল গুজব উঠেছিল যে, ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমার সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ ছিল তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, "সামনেই বড় একটা কিছু হতে যাচ্ছে।" নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১২ নভেম্বর) পূর্ব বাংলায় প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিবাত উপকূলবর্তী এলাকায় যে মরণছোবল হানে, যা ছিল এ শতকের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নির্বাচন মূলতবী রাখার অনুকূলে একটি সুবিধাজনক অজুহাত এনে দিল। স্পষ্টতঃই এ সময়ে তা করার জন্য সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে জোর চাপ এলো।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। দুর্যোগ ঘটার একদিন পরে প্রেসিডেন্ট পিকিং-এ তাঁর সরকারি সফর শেষ করে ফিরছেন। ফেরার পরে ঢাকায় তাঁর প্রথম যাত্রাবিরতি ঘটে এবং দুর্যোগের খবর শোনামাত্র তিনি এই শহরে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখেন। দুর্যোগের ব্যাপকতা তখন পর্যন্ত জানা না গেলেও স্পষ্টতঃই ঘটনাটিতে রাজনৈতিক রঙের প্রলেপ দেয়া হলো। শহরের সর্বত্র তখন গুজব চলছে, কেউ কেউ আসন্ন নির্বাচন মূলতবীর কথা বলছেন। অন্যেরা এই মর্মে ইঙ্গিত করেছেন যে, সামরিক জান্তা চূড়ান্তভাবে কর্তৃত্ব গ্রহণ করছে এবং ইয়াহিয়া খানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে তাকে সম্পদশালীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

চাপা উত্তেজনা এতই প্রবল ছিল যে, রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে পূর্বপ্রস্তুতিহীন সাংবাদিক সভায় একজন বিদেশি

সংবাদদাতা এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে সরাসরি প্রশ্ন করেন। প্রেসিডেন্টের জবাব ছিল ত্বরিত এবং স্পষ্ট। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, তিনি তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান আছেন এবং যতদিন তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান থাকবেন ততদিন রাষ্ট্রপ্রধানও থাকবেন। কোনো পদত্যাগ করার ইচ্ছে তাঁর নেই।

কয়েক সপ্তাহ আগে এমন একটি প্রশ্ন ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট সম্ভবতঃ একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই সংবাদদাতার মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি এরূপ অস্বীকার করাকেই পছন্দ করেছিলেন। এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেশের ভিত্তিতে প্রদত্ত তাঁর জবাবকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

এসবই আমার দৃঢ় বিশ্বাসকেই সমর্থন করে যে, নির্বাচনের আসন্ন বিপ্লব এবং তার পরিকল্পনার বিপদ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানকে পূর্বেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে। যেভাবেই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মতো যোগ্যতা যে তাঁর ছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্টতঃই প্রেসিডেন্টের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি মরিয়া হয়ে ঘটনা স্রোতকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু নির্বাচনের গতিকে প্রভাবিত করতে সমর্থ ছিলেন না। অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁর কথায় প্রতারিত হয়নি, তাঁরা সুদৃঢ় কল্পনীয় সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছিল। যার জন্য তাদের এত জীবন ও রক্তদান করতে হয়েছে। কেউ তাদেরকে তাদের উদ্দেশ থেকে বিপথগামী করতে পারেনি। নির্বাচনের দিন ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারলেন যে, একটা অসম্ভব কিছু ঘটে গেছে।

১৯৭১ : নির্বাচনোত্তর প্রহসন

"আজ পাকিস্তান সবচেয়ে কঠিন রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।"

–প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

মার্চ ১, ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করতে প্রেসিডেন্ট ১ মার্চ, ১৯৭১ সালে যে বক্তব্য রেখেছিলেন বাস্তবে পাকিস্তানের কঠিন রাজনৈতিক সংকট তখন ততটা ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বনাশের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঐ ঘোষণা যেন ছিল ধারালো অস্ত্রের মুখে ঝাঁপ দেওয়া। চার মাস আগে অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশকাল থেকেই সংকট নিজে নিজে অন্তঃক্ষিপ্ত হচ্ছিল। পাকিস্তানের জটিল রাজনৈতিক ঐ সংকট ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের তৈরি।

৩০০ জাতীয় পরিষদ আসনের নির্বাচনের ফলাফল হলো নিম্নরূপ ঃ

আওয়ামী লীগ	-	১৬০
ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	৮১
স্বতন্ত্র	-	১৬
মুসলিম লীগ (কাইয়ূম)	-	৯
মুসলিম লীগ (দৌলতানা গ্রুপ)	-	৭
জামায়াতে-আল-সুন্না	-	৭
হাজারভী গ্রুপ	-	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান)	-	৬
জামায়াতে ইসলামী	-	৪
মুসলিম লীগ (ফকা চৌধুরী গ্রুপ)	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	-	১

মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ ৭টি আসন পায়। ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত সর্বসাকুল্যে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে লাভ করে ১৬৭টি আসন।

নির্বাচনের ফলাফল বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রকাশ পেল। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে বাঙালিরা ছিলেন বিজয় উল্লাসে উল্লাসিত। এই প্রথমবারের মতো তারা প্রকৃত ক্ষমতা লাভের আশা করছে। এ নির্বাচন থেকে তারা অতীতের ঔপনিবেশিক আদর্শের অবসান এবং দু'দশকের শোষণের প্রতিকারের সামর্থ্য অর্জন করেছে। ভুট্টো সাহেব পাঞ্জাব ও করাচিতে অপ্রত্যাশিত বিজয়ে বিস্তৃত রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর উল্লাস চেপে রাখতে পারেননি। মৌলবাদী গ্রুপ যথাঃ জামায়াতে ইসলামী এ পরাজয় আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে নেয়নি। জামায়াতে অবশেষে জনসমক্ষে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিল। জনগণ যেভাবে তাদের রায় দিয়েছে তাতে সমগ্র দেশও বিস্মিত হয়েছিল।

এক মাস আগে পূর্ব বাংলা ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের দরুন বাস্তব ক্ষতির চেয়েও পাকিস্তানীদের কাছে নির্বাচনের ফলাফল হলো আরো শোকাবহ ও ধ্বংসাত্মক। এটা ঠিক ধর্মান্ধ প্রগতিবিরোধী দলগুলোর মূলোৎপাটনে এ নির্বাচন জনতার মতামত প্রকাশিত হলো। নতুন প্রজন্মের পাকিস্তানিরা পূর্ব পুরুষের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। তারা জনসাধারণের ধর্মানুভূতি ও অজ্ঞতাকে ধর্মব্যবসায়ী ও গোঁড়া রাজনৈতিক প্রতারকদের হাতিয়ার হতে দেয়নি। নতুন প্রজন্মের পাকিস্তানিরা ঠিক করে নিয়েছিল রাজনীতিতে জিকির আহজারি করে ধর্মের ব্যবহার আর কোনো ফায়দা লুটতে পারবে না। অন্যত্র, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের হাতে গড়া সামরিক আমলাতান্ত্রিকচক্র যা ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। এ নির্বাচন তাদের সামগ্রিকভাবে সেই প্রত্যাখানের নিশ্চয়তা দিয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেবে। গভীরভাবে লক্ষণীয় এসব পরিবর্তন শাসকচক্রকে বিপর্যস্ত করতে পারতো না, যদি তাঁদের পেশার প্রতি তারা আনুগত্য থাকতো। যা হোক এঁরা নির্বাচনের ফলাফলে অনুৎসাহী এবং অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে অঙ্গীকারবদ্ধ এই ভেবে যে, "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এবং যতশীঘ্র সম্ভব নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আত্মনিবেদিত।" এ ধরনের মামুলি বক্তব্য শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান অনেকবার দিয়ে আসছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলগুলোর খণ্ড-বিখণ্ড রূপ এবং জাতীয় ঐক্যমতের অনুপস্থিতিকে প্রধান অন্তরায় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এমতাবস্থায় শাসকচক্রের নির্বাচনের নির্ধারিত রায়কে স্বাগত জানানো উচিত ছিল। এতে শুধু সাংবিধানিক প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সমাধানই সম্ভব হতো না, উপরন্তু বেসরকারি প্রশাসনের কাছে নিরাপদে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দিতে পারতো। অন্ততঃপক্ষে এটা বোঝা যেত যে, ইয়াহিয়া খান তাঁর কামনা ফলপ্রসূ করেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এটাকে সম্পূর্ণভাবে অন্যদৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে ব্যক্তিগত বিপর্যয় বলে মনে করলেন। তার আইনগত কাঠামো বিধান, যা তিনি সন্তর্পণে পরিষদ অচলাবস্থার সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছিরেন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এখন তিনি আর পরিষদে সংবিধান প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাধান্যকে ধোঁকা দিতে

পারবেন না। সে কারণে নির্বাচনের হিসাব বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের ১৬৭ জন সদস্য বিজয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো। এমনকি জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান) সমর্থন না জানলেও এতে কোনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো না।

প্রেসিডেন্ট যে বাধ্য হয়ে সংখ্যাসাম্যনীতির বদলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের বিধান তৈরি করে পূর্ব বাংলার মানুষকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছিলেন, তার জন্য তিনি এখন নিশ্চয়ই অনুশোচনা করে থাকবেন।

রাজনৈতিক বিভাজন সম্পর্কে প্রাথমিক ভুল হিসাব এবং এ বিষয়ে পূর্ব বাংলাকে প্রশ্রয় দান সবকিছু মিলে জটলা পাকিয়ে গেল। সংখ্যাসাম্য বা প্যারেটি বজায় থাকলে শেখ মুজিবুর রহমান বড়জোর অর্ধেক আসন পেতেন পরিষদে, তাতে পরিষদের কার্যাবলী কৌশলের সঙ্গে চালান যেতো। এখন যা হয়েছে, তাতে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেখ মুজিবকে এককভাবে নিজ ক্ষমতা জাহির করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। এতে ইয়াহিয়া খান নতুনভাবে আশংকিত হয়ে উঠলেন। শেখ মুজিব অকপটে খোলাধুলি ঘোষণা করলেন যে সংবিধান প্রণয়নের একক ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

এক্ষণে আগে থেকে প্রত্যাশিত প্রথম বাধাস্বরূপ অর্থাৎ পরিষদের ভোট প্রদান পদ্ধতি এখন আদৌ আর বাধা হলো না। সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সংবিধান পাস করার তাগিদ দিতে পারে। এ কাজ করতে শেখ মুজিব সমস্ত কার্ড বা তাস টেবিলে রেখে ছয় দফা দিয়ে সমস্ত পিট জিতে নিতে পারবেন। এ হেন অবস্থায় সংবিধান বিলে প্রেসিডেন্টের অসম্মতি জানান হবে বোকামি, এমনকি পরিণতি হবে ভয়াবহ। যে গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের গদি হারাতে হয়েছিল, সংবিধান বিলে সম্মতি না জানালে ফলশ্রুতিতে তার চেয়ে ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হতে পারতো। সেভাবে তিনি কাজ করলে ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ ঘটত একজন স্বৈরাচারী হিসেবে—ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আন্তর্জাতিক সমাজে নিন্দার ভাগীদার হতেন আর যাবতীয় বৈদেশিক আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের পথ হতো রুদ্ধ।

প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টারা জটিল বিকল্প কৌশল নিয়ে 'যুদ্ধংদেহি' মনোভাবে পরস্পরের বৈপরীত্যেও সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমটি ছিল, কৌশলগত পরিকল্পনার পরাজয়কে গলাধঃকরণ করা এবং বেসামরিক সরকারের নিকট অবধারিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হাসিমুখে মেনে নেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো এই গণরায়কে অস্বীকার করে তা মেনে না নেওয়া। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ ছিল না।

ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেন। সঙ্গত কারণে প্রথম পথটি গ্রহণ করেননি। কারণ পরিণতিতে তা হতো আত্মঘাতী—তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের জন্য। আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

করুণভাবে খর্ব করতো না, এমন কি তার নিজেরও ক্ষমতা হ্রাস পেতো। সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দিত। কেননা সামরিক বাহিনীর যাবতীয় অর্থ ও বাস্তব উদ্দেশের জন্য প্রদেশগুলোর ওপর বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তো। এবং শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছেন যে সামরিক বাহিনীর আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা খর্ব করবেন যাতে তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে আর কখনো নাক গলাতে না পারেন।

এ সব কারণ থেকেই ইয়াহিয়া খান নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিলেন, আওয়ামী লীগ যতদিন তাদের খসড়া সংবিধানের নমুনা তাদের কাছে পেশ না করবে ততদিন পরিষদের অধিবেশন বসবে না। এটা অনুমান নয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পরবর্তী কাজের মধ্য দিয়েই এ অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইয়াহিয়া খান যদি তাঁর সিদ্ধান্তে বিকল্পটি গ্রহণ করতেন এবং জনগণের রায়কে মেনে নিতেন, তাহলে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভিন্নতর হতো। তাহলে দেশে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সংকট থাকতো না বা কখনোই দেখা দিত না। দেশ অবশ্যম্ভাবীভাবে বিভক্ত হয়ে যেত না এবং পূর্ব বাংলার লাখ লাখ (৩০ লাখ) লোককে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। গণরায় মেনে নিলে ১৯৭১ এর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরিষদের অধিবেশন বসতো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সংবিধান গ্রণয়নে খুব একটা প্রতিবন্ধকতা পেতে হতো না।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতো, পাকিস্তান অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেত। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের পরে দেশের সর্বত্র জনগণ এই আশাই করেছিল। এবং এটাও অনেকের জানা ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সকল সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তা সত্ত্বেও নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। জনগণ তাঁকে এবারের জন্য সুযোগ দিয়েছেন এবং এটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অর্জিত অধিকার।

বেশ কয়েকটি আসন বিশেষতঃ রাওয়ালপিণ্ডি, করাচি এবং সিন্ধুর কিছু অংশে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলো। কিন্তু সবকটি নির্বাচনী এলাকায় তারা পরাজিত হয়েছে। ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত ১৬৭ জনকে নিয়েই চলতে হবে। ভুট্টো সাহেবের পাকিস্তান পিপলস পার্টি অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮১টি আসন পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১টি আসনও তাঁর দল পায়নি।

পরিষদের এই কৌতূহলজনক চেহারার মধ্যে শাসকচক্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অশুভ খেলার অপূর্ব সুযোগ খুঁজে পেলেন। অন্য সুযোগটি হলো মওলানা ভাসানী এবং অন্য কয়েকজনের ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্বাধীনতার জন্য জিকির তুলে শেখ মুজিবকে অবশ্যম্ভাবীভাবে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এসব ঘটনা শাসকচক্রকে অশুভ তৎপরতা চালানোর পথ সহজ করে দিল।

এ কথা ছড়িয়ে পড়লো যে দেশের ঐক্য বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কেউ মওলানা ভাসানীর দাবির জন্য নিন্দা জানালো না। পরিবর্তে তাঁর বক্তব্য দিয়ে শেখ

মুজিব ও তাঁর দলের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের প্রতি কালিমা লেপন করা হলো। একই সময়ে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্রগুলো (তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান ও দি মর্নিং নিউজ) এ ধারণা প্রচারে মেতে উঠলো যে, নির্বাচন দুই দল শাসনব্যবস্থাকেই নয় (আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি) বরং 'দুই পাকিস্তান' সৃষ্টিতে উৎসাহী করছে। বাঙালি উঠতি শক্তির হুমকির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করতে পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই ভুট্টো-মুজিব একটি গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সমঝোতা সূত্রের কথা উত্থাপিত হয়।

এই ফাঁদে আটকানোর উদ্দেশ্যপূর্ণ যুক্তি ছিল বাস্তবতার সুস্পষ্ট বিকৃতি। একদিকে ভুট্টো সাহেবের ভাগ্য তারকা যতই উজ্জ্বল হোক সমগ্র পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পক্ষে কথা বলতে তিনি পারেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশ রয়েছে। ভুট্টো সাহেব শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব করছেন, সমগ্র দেশের নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁর সমর্থক নগণ্য এবং বেলুচিস্তানে তাঁর একেবারেই প্রতিনিধিত্ব নেই। পাঠান ও বেলুচিস্তানের নামজাদা নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের ভাগ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন।

একটি রাজনৈতিক গ্রুপ যাঁরা সিন্ধু, পাঞ্জাবে ভুট্টো সাহেবের বিরোধী তারাও শেখ মুজিবের গতিপথে আলাপ আলোচনায় আসতে শুরু করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের এ সমর্থন ও পূর্ব বাংলায় নিরঙ্কুশ সমর্থনের বলে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান দেয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবি করার ক্ষমতা রাখতেন যা দেশের আপামর জনসাধারণের কাছেও গ্রহণযোগ্য হত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁকে ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে কোনো রকম সমঝোতার আর দরকার হয় না। অতএব পরিষদ অধিবেশনের আগেই ভুট্টো-মুজিব সমঝোতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভুট্টো সাহেব যেটুকু সুযোগ পেতে পারেন তা হলো পরিষদের সংখ্যালঘু বা বিরোধী দলের আসন গ্রহণ।

দেশের অখণ্ডতা যে হুমকির সম্মুখীন সে সময় এ মর্মে আনীত অভিযোগের সামান্যতম অস্তিত্ব ছিল না। আমি আগেই বলেছি, মওলানা ভাসানী এবং তাঁর তৎকালীন অনুচর সহকর্মীরা যারা স্বাধীনতার ধুঁয়া তুলে শেখ মুজিবের আত্মজাহির প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তাদের এসব বক্তব্য রাজনৈতিক অরণ্যে রোদনই হয়েছে। নির্বাচনের পর তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারোর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয় লাভ করে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করলেন— স্বাধীনতার নয়। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার এই যে, নির্বাচনের সময় বা আগে এমনকি বিজয়ের পরেও একবারও শেখ মুজিব স্বাধীনতার আহ্বান জানাননি। পাকিস্তান সরকার ৫ আগষ্ট ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এ সত্যের অবতারণা করেছে। ৪নং পাতায় এটা বলা হয়েছে ঃ

> "জনসমক্ষে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির ঘোষণায় পাকিস্তানের সার্বভৌম কাঠামোর কোনো পরিবর্তনের বা সংকোচনের দাবি ছিল না।"

১নং দাবিতে বলা হয়েছে যে, "সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকবে"। শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণায় বহুবার দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে,. তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চান, দেশের অখণ্ডতা এবং ইসলামী বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাননা। ১৯৭০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, "ছয় দফার প্রোগ্রাম আদায় হবে এবং সে সঙ্গে দেশের অখণ্ডতা ও ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালে ঢাকায় এক জনসভায় তিনি "নির্বাচনকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট বলে চিহ্নিত করেন। সিলেটে অন্য এক জনসভায় ৬ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা প্রোগ্রাম "কেবল সংবিধানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিশ্চিত করে পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষা করাই।"

আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন।

এসবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক অগ্রগতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেও জেনেছে যে আওয়ামী লীগের নীতি দেশের সংহতির জন্য হুমকি ছিল না। এ ধরনের আশংকা করারও কোনো ভিত্তি ছিল না যে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তার বা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে। তথাপি ইয়াহিয়া খানের এ ধরনের কোনো ইচ্ছা ছিল না। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পতন। কৌশল হিসাবে পরিষদ বসার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংবিধানিক সমস্যা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা যা আগের মতই রাজনৈতিক মতভেদকে বাড়িয়ে দেবে। প্রেসিডেন্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ অস্ত্র ও সুবিধাজনক পরিস্থিতি উভয় দেখতে পেলেন। প্রথমটি ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। তাকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশেষ কৌশলে ব্যবহার করা । আর দ্বিতীয়টি হলো পরিষদের গঠনের আকার প্রকার।

সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি অনিষ্টকর মনগড়া যুক্তিকেই বক্তব্যে এবং নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করছিল এবং সরকারিভাবে সরকারের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়া খান নিজে শেখ মুজিবকে নির্বাচনের পরে ১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি তাদের প্রথম সাক্ষাতকারে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, "পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুন।"

স্পষ্টতঃই নির্বাচনের ফলাফল এড়িয়ে গিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের পট সৃষ্টির প্রস্তুতি চলছিল। আমি আগেই বলেছি এসবের উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করা যা প্রেসিডেন্টকে সংবিধানের প্রশ্নে আরেকবার প্রতারণা করার সুযোগ দেয়। যাতে তিনি তাঁর আধিপত্য ও সামরিক প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারেন। তা'ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অন্য কোনো অজুহাত ছিল না।

আমি পরে দেখাবো যে, দেশের ঐক্য অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই দ্বন্দ্ব বাড়ানো হচ্ছিল। প্রেসিডেন্টের বেসরকারি সাংবিধানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী লন্ডনের বক্তৃতায় এ অভিপ্রায় প্রকাশ না পেলেও কিন্তু লক্ষণে তার যথেষ্ট আলামত ছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটেছে।

ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের ভরাডুবি ঘটেছে। এজন্য আওয়ামী লীগ নয়, ইয়াহিয়া খানই উভয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

নির্বাচনের পরে প্রেসিডেন্ট পর্দার অন্তরালে থেকে সুকৌশলে ও উদ্যমের সঙ্গে চাল দিতে থাকেন। কিন্তু জনসমক্ষে তিনি কিছুই করেননি, এমন কি বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বৈঠকের তারিখ পর্যন্ত তিনি নির্ধারণ করেননি।

সারা ডিসেম্বর মাস এবং ১৯৭১ সালের প্রথম দশ দিন জনগণ খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে, ইয়াহিয়া খান দৃশ্যত ক্ষুদে পাখি শিকারীর মতো মত্ত রয়েছেন। এজন্য তিনি করাচি, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, ভাওয়ালপুর এবং ভুট্টোর আবাসভূমি লারকানা এসব স্থানে সিন্ধি ভূস্বামীদের দ্বারা মহোৎসবে আপ্যায়িত হচ্ছেন। যদিও সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ক্লাব নানা ধরনের অশুভ গুজবে পূর্ণ ছিল। সাধারণ জনগণ মোটেই জানতে পারলো না যে প্রেসিডেন্ট একটা বড় খেলার পেছনে ছুটছেন।

ইসলামাবাদের স্টেট ব্যাংক মিলনায়তনে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসার জন্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কাঠমিস্ত্রি, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ এবং আসবাবপত্রের কাজ দ্রুততার সঙ্গে অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ঐ চেম্বারে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়ার জন্য আধুনিক সকল সরঞ্জামাদি এবং সেই সঙ্গে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে তর্জমার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। শুধু একটি জিনিসেরই অভাব ছিল তা হলো পরিষদের বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্টের ঘোষণা। আমরা পরে দেখবো এই ঘোষণা ১৩ ফেব্রুয়ারির আগে ঘোষিত হয়নি। যখন শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে সময় সীমা বেঁধে দিয়ে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করে, তার দু'দিন আগে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

এ সময়ে প্রেসিডেন্টের প্রধান কাজ হলো আঞ্চলিক বিরোধকে বাড়িয়ে দেয়া যাতে ভুট্টোকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মুজিবের অগ্রগতিকে বাধা দেয়া যায়। এ ব্যাপারে ভুট্টোও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে স্বেচ্ছায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

আমি বহু বছর ধরে ভুট্টো সাহেবকে জানি। তাঁর আকর্ষণীয় রাজনৈতিক সৌভাগ্যের পরিবর্তন খুব কাছে থেকে অতিরিক্ত প্রীতির সঙ্গে জেনেছি। আমি সবসময় চতুর রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু তিনি অতিরিক্তভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক স্নায়ুতে প্রাথমিকপর্বে অনিবার্যরূপে তিনি সুবিধাবাদীর অঢেল রঙে নিজেকে রাঙিয়েছেন।

আইয়ুব খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত আমলা-সামরিক প্রাতিষ্ঠানিক চক্রকে উৎখাত করতে গণঅভ্যুত্থানকে ভুট্টো সাহেব সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারপর আত্মবিরোধী হলেও জনতার সঙ্গে আরেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তিনি ইহুদীদের ছাগলের ভূমিকায় নিজেকে ব্যবহৃত হতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে মহত্ত্বের উপাদান ছিল। সুবিধাবাদই তাঁর ভরাডুবি ঘটিয়েছে। এর জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

নির্বাচনের পরিসংখ্যানে পাঞ্জাবের বিজয় প্রেক্ষিতে তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্রোতের মুখে ভুট্টো সাহেব অসহায় বোধ করলেন। তিনি বুঝলেন যে ঘটনার স্বাভাবিক নিয়মে তিনি বড় জোর পাঞ্জাব ও

প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রে এবং জাতীয় পরিষদে তাঁর ভূমিকা হবে সামান্য। সম্ভবতঃ বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা এমন জিনিস যা তিনি কখনো হজম করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধান হিসেবে তিনি নাসেরের মতো তাঁর ভূমিকা মনশ্চক্ষে দেখতেন।

ভুট্টো সাহেব সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে যে গণতান্ত্রিক অনুশীলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন– তিনি যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা মেনে চলতেন তাহলে এক সময়ে তিনি তাঁর কামনা পূর্ণ করতে পারতেন। শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে সব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব বিরোধী দলের সমালোচনার শিকার হয়ে পড়তেন। তখন ভুট্টো তার বিপ্লবী অর্থনীতিক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না।

ভুট্টো সাহেব চতুরতার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, যে তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামরিকচক্রের স্বার্থের মিল রয়েছে। সুতরাং তিনি যদি হাতের তাস ঠিক মতো চালতে পারেন তাহলে দেশের শীর্ষপদ তীরবিদ্ধ করতে পারবেন। আমি নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারি যে ভুট্টো সাহেব শুরু থেকেই ইয়াহিয়ার সব কৌশল জানতেন। তিনি এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন যে, এসব কিছু তিনি তাঁর স্বার্থে লাগাবেন এবং অবশেষে প্রেসিডেন্টকে পর্যুদস্ত করতে পারবেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কিংবা নিজের সম্পর্কে অতিশয় গুরুত্ব দানের জন্য ভুট্টো সাহেব বুঝতে পারেননি যে শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটাবার জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যেভাবে প্রতারণা করতে হচ্ছে তা একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তার মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন করবে এবং প্রেসিডেন্টের কুমতলব হাসিল হলে তিনি আর ভুট্টোকে ব্যবহার করবেন না।

ঘটনা যাই হোক, নির্বাচনের পর ভুট্টো অতি বেশি উৎসাহী হয়ে পড়লেন এবং বিরাট একটা কিছু হওয়ার স্বপ্নে তখন তাঁর মন বিভোর ছিল । বৈধভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মনে যে স্বপ্ন থাকতে পারতো সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশি। এ হেন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা প্রথমবারের মতো ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। যিনি শেখ মুজিবের বাণী ভুট্টো সাহেবের জন্য বয়ে নিয়ে গেছেন তিনি আমাকে প্রথমবারের মতো এই ঘটনা বলেছেন, এই বিশেষ দূত ছিলেন লন্ডনস্থ একজন বাঙালি ছাত্র, তিনি ঢাকায় খণ্ডকালীন সফরে ছিলেন। তিনি উভয়ের কাছেই খুব পরিচিত। আমি এখানে তাঁর নামের উল্লেখ করিনি। এটা করিনি শুধু তাঁর নিরাপত্তা ও অনুরোধের কারণে। নির্বাচনের তিন সপ্তাহ পরে তিনি যখন শেখ মুজিবুর রহমানকে ভুট্টো সাহেবের সৌজন্য সাক্ষাতের অভিপ্রায়ের সংবাদ জানালেন, প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বললেন, 'ভুট্টো সাহেবকে বলো, তিনি যদি উচ্চ পদ দাবি করেন আমি তা' দিতে প্রস্তুত আছি। তবে তিনি যদি আমার ছয় দফা গ্রহণ করেন।' শেখ মুজিব ভুট্টো সাহেবকে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি থেকে বের করে সেনা ছাউনিতে ফেরত পাঠাতে।

শেখ মুজিবের ওই বাণী যথারীতি করাচিতে বয়ে নেয়া হল। ভুট্টো সাহেব লারকানা থেকে সবে তখন ফিরেছেন এবং তাঁর ক্লিফটনের মনোরম বাসভবন যথারীতি

গুলজার করছিলেন। সেখানে মোসাহেব ও বন্ধুদের ভীড়, সে সঙ্গে নবনির্বাচিত উভয় পরিষদের ক'জন সদস্যও রয়েছেন। ভুট্টো সাহেবের খাসমহলে বাঙালি ছাত্র নেতাকে আমন্ত্রণ করা হলো। সেখানে তিনি এক গ্লাস হুইস্কি পানের ফাঁকে গোপনে তাঁর দূতালিবাণী পৌঁছে দিবেন।

ভুট্টো সাহেব ভাবাবিষ্ট হলেন, তিনি স্বার্থ জড়িত দুটি বড় চোখের ঔৎসুক্যের চাহনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কী তিনি (শেখ মুজিব) একথা বলেছেন? যখন বার্তা সত্য বলে জানলো, ভুট্টো সাহেব তাঁর শুক্রবারের বিশেষ সহচর বাবুকে সরাসরি আলাপের জন্য শেখ মুজিবের টেলিফোনে সংযোগ দিতে বললেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাকে বাসায় ও পার্টি অফিসে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। ভুট্টো সাহেব দমে গেলেন না। তিনি বললেন, 'আমার বার্তাবাহক শেখ সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তাঁকে বলবেন, আমি ক'টা উপনির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। এখন সাক্ষাৎ করতে পারছি না। কিন্তু আমি মোস্তফা খানকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ছয় দফার বিরোধী নই, তবে আমার সঙ্গে আমার পার্টিকেও নিতে হবে।"

এই বার্তা পরদিনই টেলিফোনে শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেয়া হয়। একদিন পরে ভুট্টো সাহেবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মোস্তফা খান ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দিলেন।

এ ঘটনা থেকে কিছু এসে যায় না, তবু এ ধরনের ঘটনার রোমন্থন সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ রহস্যময় অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ভুট্টো সাহেব তখন ক্ষমতার শীর্ষপদ দখলের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছেন, তিনি আগ্রহের সঙ্গে একজনের প্রস্তাবে প্রলোভিত হলেন, কেননা ব্যক্তিটি পরিষদে তাঁর সব পাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন। এ তথ্য থেকে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, ভুট্টো সাহেবের পরবর্তীকালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণ, যখন তিনি দেখলেন প্রেসিডেন্ট কোনোক্রমেই শেখ মুজিবকে তাঁর পক্ষে চলতে দিতে দৃঢ়ভাবে নারাজ। কিন্তু শেখ মুজিব কি আন্তরিকভাবে সচেতন ছিলেন? না কী তিনি দানা ছড়াচ্ছিলেন? (দানা অর্থ খাদ্যশস্য, এখানে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের ছেঁদো রাজনীতিবিদের ফাঁদে ফেলতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

শেখ মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং তাঁর মানসিকতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে খুব কাছ থেকে জানার অভিজ্ঞতা আমাকে তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করেছে। এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দৃশ্যতঃ প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব হ্রাস করেছে। শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন যে, তিনি ঐ পদের জন্য উদ্বাহু নন বরং তিনি নিজ প্রদেশের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

অন্যটি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলীয় গঠনতন্ত্র ও ছয় দফা কর্মসূচি ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে সরকার অনুমান করে পূর্বেই ব্যর্থ করে দেবে এ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পূর্ব বাংলায় ও পরিষদে অনবদ্য অবস্থান সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি যথার্থ দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে কীভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে অসুবিধা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ভুট্টো

সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি জেনারেলদের দিকে চাল ঘুরিয়ে দিয়ে থাকবেন। এ হেন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থ করে দিলেন, জনগণ ও সামরিক শাসকচক্রের মধ্যে সরাসরি লড়াই বেঁধে যাবে। এটা আইয়ুব খানের পতনের সময় গণঅভ্যুত্থানের মতো তীব্র হতে পারে এবং পরিসমাপ্তিও একই রকম হবে।

এসব পরিস্থিতিতে ভুট্টো সাহেবকে উচ্চপদের প্রস্তাব ছিল সুচিন্তিত প্রথম চাল এবং এজন্য সামান্য মূল্য দিয়ে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি থেকে বিদায় দিয়ে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেয়া। এ প্রচেষ্টা সদিচ্ছার অভাবের জন্য ব্যর্থ হয়নি। ইয়াহিয়া খানের ভয়ংকর রাজনৈতিক নির্বাচনোত্তর প্রহসনের অগ্রগতির কারণেই তা হয়েছে। তাছাড়া ভুট্টো সাহেবের মনে প্রেসিডেন্টের সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাবের জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে, এ ধারণা ভুট্টো সাহেবের মনে ছিল।

১৩ জানুয়ারি নির্বাচনের ঠিক ছয় সপ্তাহ পরে ইয়াহিয়া খান বহু বিস্তৃত শিকার ত্যাগ করলেন এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন। প্রেসিডেন্ট অবশ্য আগেই লারকানায় ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। এটাকে বর্ণনা করা হয়েছে আকস্মিকভাবে মত বিনিময়ের আলোচনা, কেননা প্রেসিডেন্ট তখন ঐ এলাকায় সফরে ছিলেন। কিন্তু যতই এটা নৈমিত্তিক ও উদ্দেশ্যহীন বলে চালান হোক না কেন আওয়ামী লীগের এটা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের শীঘ্র অধিবেশনের আহ্বান জানিয়ে বারবার শেখ মুজিবুর রহমান ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেখ মুজিব নিজের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য আওয়ামী লীগ সদস্যদের দলীয় গঠনতান্ত্রিক ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রকাশের কারণে জনসমক্ষে শপথ গ্রহণ করালেন। এ ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে দুঃখজনক প্ররোচনা হিসেবে গৃহীত হল। এসব জটিল বিষয়গুলো আরো ত্বরান্বিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় সংবাদপত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন না এই মর্মে সংবাদ প্রকাশের ফলে। কিন্তু তিনি তাঁর বাসভবনে নির্ধারিত বৈঠক করতে চেষ্টা করছেন এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হলো। এ ধরনের বানোয়াটি গুজব যা দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে চালান হচ্ছিল। এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলে শেখ মুজিব জনসমক্ষে তা অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান স্পষ্ট করে জানালেন প্রেসিডেন্ট যখন ঢাকায় সফরে আসবেন তখন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে, শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং দ্বিধাহীনভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধানের মধ্যে বৈঠক কোনোরূপ মনোমালিন্য ছাড়াই আন্তরিক পরিবেশে সমাপ্ত হয়। সংবিধান সম্বন্ধে তার ধারণার বিশদ আলোচনা না করেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোতে সামরিক বাহিনীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের কতগুলো ভুল ধারণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি জানি যে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানকে আগামী দু'বছরের সামরিক বাজেট অপরিবর্তিত থাকবে মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধানের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর এবং বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন–

"জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের গৃহীত কর্মসূচি শপথনামার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এসবের নিহিতার্থ সম্বন্ধে অবগত থেকেই আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু আশার বৈপরীত্যে, ইয়াহিয়া খান সংবিধান সংক্রান্ত তাঁর ধারণা কখনই প্রকাশ করেননি। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এমন হাবভাব দেখালেন যে ছয় দফায় আপত্তিজনক কিছু দেখতে পাননি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন।"

প্রেসিডেন্ট রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগের পূর্বে সাংবাদিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তায় শেখ মুজিবকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বললেন। বাঙালিরা এতে উৎফুল্ল ও বিস্মিত হলো।

প্রেসিডেন্ট কী আন্তরিক ছিলেন? এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। যদি তা হতেন প্রেসিডেন্ট তাহলে শেখ মুজিবের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার দাবি মেনে নিতে ততটা আপত্তি করতেন না। পক্ষান্তরে, ইয়াহিয়া খান কখন জাতীয় পরিষদ বসবে তার কোনো ইঙ্গিত দিলেন না বরং ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। ভুট্টো সাহেবকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি রেখেছিলেন। এ ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বিরোধকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হলো।

২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ ভুট্টো সাহেব যখন দলের লস্কর ও উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকা পৌঁছলেন তখন তাঁর মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে শেখ মুজিবের বার্তা পেয়ে যতটা আগ্রহের ভাব দেখা দিয়েছিল এখন তা নেই। যদিও ভুট্টো আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে আধ ঘণ্টা অন্তরঙ্গ একান্ত বৈঠক করেছেন। কিন্তু তাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের সঙ্গে হাত মেলানোর কোনো লক্ষণই ভুট্টো পরিষ্কার করে দেখাননি। উপরন্তু ছয় দফা গঠনতন্ত্রের তিনি ব্যাখ্যা চেয়েছেন। তাঁর মনোভাব সর্বতোভাবে শেখ মুজিবের জন্য হতাশাজনক ও হতবুদ্ধিকর ছিল। তাজউদ্দিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"ইয়াহিয়ার মতো ভুট্টো সাহেবও সংবিধানের গঠন সম্বন্ধে কোনো বাস্তব প্রস্তাবনা দিতে পারেননি। তিনি এবং তাঁর উপদেষ্টারা প্রধানতঃ ছয় দফার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনাতেই উৎসাহী ছিলেন। যেহেতু তাঁদের অভিব্যক্তিই ছিল নেতিবাচক এবং তাঁদের নিজস্ব কোনো যুক্তিও এখানে দাঁড় করাননি। সে কারণে দুটি দলের মধ্যে কোনো আন্তরিক সমঝোতা সৃষ্টিতে বা উভয় দলের মধ্যে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণে আলোচনার কোন সম্ভাব্য অগ্রগতি হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় যে ভুট্টো সাহেবের তখন নিজের কোনো আনুষ্ঠানিক অবস্থা ছিল না যা দিয়ে তিনি সমঝোতার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন।"

তাজউদ্দিন আহমদে সাহেবের উপসংহারে আমি একমত হতে পারছি না। ভুট্টো অতটা বোকা ছিলেন না। তিনি কী চাইছেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নেই

এটা ঠিক নয়। আসলে বিষয়টি দাঁড়াল এই, ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো চক্র শেখ মুজিবকে অবরোধ করার জন্য আগে থেকে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছেন। আওয়ামী লীগের কাছে অকালে দাবি তুলে তাঁরা তাদের অভিসন্ধি ফাঁস করে দিতে চাননি। সেটা পরে আসবে। তখনকার মতো আলোচনার গতি রক্ষা করে জনগণ ও আওয়ামী লীগ উভয়কে প্রতারণা করাই যথেষ্ট ছিল। এবং আগামীতে অভিযোগ উপস্থাপনের ভিত্তি প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এই ঘোর দৌরাত্ম্যপূর্ণ প্রহসনের প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রেসিডেন্টের শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতকার আর দ্বিতীয়টি হলো ঢাকায় দুই সপ্তাহ পরে ভুট্টো শেখ মুজিবের আলোচনা।

অন্যান্য পদক্ষেপের পর্যায়ক্রম নিদারুণভাবে বিস্ময়কর ঃ ২৯ জানুয়ারি ঃ ভুট্টো সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা অমীমাংসিত রেখে ঢাকা ত্যাগ করলেন। তিনি যাওয়ার সময় ঐকমত্য প্রকাশ করেন যে আলোচনার দরজা প্রশস্তভাবেই খোলা রয়েছে, তিনি আবার আলোচনার জন্য আসবেন। কিংবা আলোচ্য বিষয়গুলো পরিষদের লবিতে বা কমিটিগুলোতে উত্থাপিত হবে।

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মুলতানে দু'দিনব্যাপী দলীয় প্রতিনিধিদের সভার পর ভুট্টো সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, পিপিপি'র খসড়া সংবিধানের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হলেন এবং খসড়া সংবিধানের বিষয়ে তাঁর মতের আপেক্ষিক পরিবর্তন হলো।

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় ৩ মার্চ বসবে। ভুট্টো পেশোয়ার ফিরে গেলেন। ঐ রাতেই এক ককটেল পার্টিতে ভুট্টো সাহেব গ্লাস হাতে হঠাৎ যে কথা বললেন তাতে সবাই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো চমকে উঠলেন।

"ভুট্টো আরেকবার ঘোড়ার জিনে পা রেখেছেন ক্ষমতাসীনেরাও তাই চায়। মুজিবকে বের করে দেয়া হয়েছে। আমিই হবু প্রধানমন্ত্রী।"

১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান ওয়ালী খানের সঙ্গে ভুট্টো সাহেবের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। ভুট্টো সাহেব চাচ্ছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে বিরোধিতা করতে, ওয়ালী খান সাহেব তাঁর সঙ্গে হাত মেলান। যখন ওয়ালী খান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, ভুট্টো সাহেব সঙ্গোপনে তাঁকে বললেন, 'আমার দলও না যে আমি ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যাচ্ছি না।

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো সাহেব বলেন যে তিনি ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করবেন যদি না পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষণে সংবিধানের রূপরেখায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পূর্বাহ্নে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়। ভুট্টো সাহেব হুমকি দেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো সদস্য জাতীয় পরিষদে যোগদানের চেষ্টা করলে পা ভেঙ্গে দেয়া হবে।'

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইয়াহিয়া খান তাঁর অসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। যদিও কোনো সরকারি ঘোষণা দেয়া হয়নি, শহর গুজবে পূর্ণ ছিল, কেউ বলছে পরিবর্তন আসন্ন, অন্যরা এমনও বললেন, প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিব্রত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন।

২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুট্টো সাহেবের হুমকি সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ন্যূনতম ৩৬ জন পরিষদ সদস্য উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসার টিকিট বুক করেছেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুট্টো সাহেব জনসমক্ষে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার আহ্বান জানান।

১ মার্চ ঃ ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা না করেই জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। অজুহাতে বলা হয়– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এবং পিপিপি দলের অধিবেশন বয়কট, এসবের কারণ হিসেবে বলা হলো– "পাকিস্তানে গভীরতম রাজনৈতিক সংকট।"

আমি রাজনৈতিক ঘটনাবলির কাঠামোর প্রধান দিকগুলো পেশ করেছি। কেননা এগুলো পরিষ্কারভাবে দুষ্কর্মের ধারাবাহিক সংযোগসমূহ এবং নির্বাচনপূর্ব প্রহসনের নমুনার বিষয়ই প্রকট করে তোলে।

প্রথমত, শাসকচক্র ভুট্টো সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর এই বিরোধকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এবং এর সংবিধান প্রণয়নে বাধা দেয়। এসব করা হয়েছে দুর্বল যুক্তির অজুহাতে এবং সত্যের স্পষ্টতম বিকৃতি ঘটিয়ে।

পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণার সময় ভুট্টো সাহেবকে এ ধারণা দিয়েছিল যে পরিষদ হবে শুধুমাত্র সংবিধান অনুমোদনের জন্য, যা আওয়ামী লীগ আগেই প্রণয়ন করেছে এবং যার কোনো শব্দের এক ইঞ্চি সরানো যাবে না। ভুট্টো সাহেব আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান দেখেননি বা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে বিকল্প প্রস্তাবাবলি নিয়ে আলোচনাও করেননি। ১৭ দিন আগে যখন তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন তখন এ ধরনের অচলাবস্থার সামান্যতম ইঙ্গিত দেননি। তিনি বিশেষভাবে আভাস দিয়েছিলেন যে, তিনি আবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আর কোনো যোগাযোগ রক্ষা করেননি, সুতরাং কখন অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো?

শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন, একটি বিষয়ে তিনি জোর দিলেন তা' হলো গণতন্ত্রের প্রয়োজনে জাতীয় পরিষদে বিতর্কের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। পরিষদের বাইরে গোপনশালার সংবিধান প্রণীত হওয়া উচিত নয়। তিনি এ মনোভাব কখনো দেখাননি যে, তিনি শক্তির মাধ্যমে পরিষদকে রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে সংবিধান পাস করিয়ে নেবেন। নিশ্চিতভাবে একথা তিনি

কখনই বলেননি যে আওয়ামী লীগের প্রণীত খসড়া এক ইঞ্চি এদিক বা ওদিক নড়ানো যাবে না? সুতরাং ভুট্টো সাহেবের ধারণা হলো আশ্চর্যজনক। হয়ত তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক অতীন্দ্রিয় কল্পমূর্তি রচনা করার ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে তিনি অদৃশ্য বস্তু দেখতে পেতেন অথবা তিনি বিশেষ কর্মসূচি নিয়েই ও সব কাজকর্ম করছিলেন। যাহোক তিনি অতিশয় ধীশক্তিসম্পন্ন হবেন, তাই বলে তিনি সুদূরে মনবীক্ষণ করতে পারেন, সে দাবি করতে পারবেন না। সুতরাং যে ধারণা হয়, তা হলো তিনি বিশেষ কর্মসূচির আকর্ষণেই এসব কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনার পরম্পরায় তাতেই যুক্তিসঙ্গত সমর্থন মেলে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচিই প্রেসিডেন্টকে ১৩ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য একটি তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য করে। এটাও ইঙ্গিতহীন ছিল না, প্রেসিডেন্ট রাওয়ালপিন্ডিতে এক নাগাড়ে ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আলোচনার একদিন পরই ঐ ঘোষণা দেয়া হয়।

ভুট্টো সাহেব মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জনসমক্ষে তাঁর আকস্মিক সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করলেন, তা সহসা ঘটনা সমূহের যুগপৎ সংগঠন ছিল না। ১১ ফেব্রুয়ারী মুলতানে তিনি পিপিপি'র খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বলেছেন। ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের কথা ওয়ালী খান সাহেবকে বলেছেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ককটেল পার্টিতে শাসকচক্রের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভুট্টোর হটকারিতার কথাও ভুলবার নয়। এসমস্ত প্রমাণ থেকে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না কে কার সঙ্গে এবং কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছেন।

একই সময়ে শেখ মুজিব কী করছিলেন? নিশ্চয়ই ভুট্টো সাহেব কিংবা খোদ প্রেসিডেন্টের মতো তিনি ক্ষতিকর কিছুই করেননি। জানুয়ারি থেকেই বিদেশি পত্রিকার সংবাদদাতা উল্লেখ করছিল যে, আওয়ামী লীগ নেতা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এটাকে অপরিহার্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই বিরক্তিজনক কারণেই পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব হয়।

ভুট্টো সাহেব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা সত্ত্বেও শেখ মুজিব উত্তেজিত হননি। আমার ধারণায় শেখ মুজিবের একমাত্র ভুল হলো, তিনি পশ্চিম পাকিস্তান নির্বাচনোত্তর সফরে যাননি। করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে যদি তিনি স্বল্পস্থায়ী সফরে বক্তৃতা দিতেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পেতে পারতেন। তাহলে কায়েমি স্বার্থান্বেষী দলগুলো তাঁর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক যে প্রচার চালাচ্ছিল তাও ব্যর্থ হত।

ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তাও অর্থহীন। ১৯৭১ সালে ১ মার্চে প্রদত্ত তাঁর বেতার ভাষণে তিনি বলেছেন ঃ

> 'গত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা বৈঠক বাস্তব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে একটা মতৈক্যে

পৌছানোর পরিবর্তে আমাদের কোনো কোনো নেতা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এটা হলো সবচেয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি জাতির ওপর বিষণ্নতার ছায়া ফেলেছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে হল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল এমন মনোভাবের কথা ঘোষণা করেছে যে তাঁরা ৩ মার্চের '৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হবেন না। উপরন্তু ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সমগ্র পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে কারণে, আমি এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পরবর্তী তারিখে আহ্বানের জন্য মূলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

এই ভাষণে আরো যুক্তি দেখাতে গিয়ে ইয়াহিয়া খান বলেন, "আমি জেনেছি যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে যদি ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের কাজে অগ্রসর হই তাহলে পরিষদের সংহতি বিনষ্ট হতে পারে এবং আমার পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

পাকিস্তানের ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী রূপে চিহ্নিত এই ভাষণ আসল ঘটনা বর্জনের জন্য এবং তারচেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক যুক্তি ও সত্য ঘটনার ডাহা বিকৃতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, প্রেসিডেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন এবং আওয়ামী লীগের ওপর দোষারোপ করেছেন। ভুট্টো সহেবের সমালোচনা তিনি একেবারেই করেননি।

দ্বিতীয়ত, ভুট্টোর অধিবেশন বর্জনের কারণে জাতীয় পরিষদের সংহতি বিনষ্ট হবে এমন আশংকার পেছনে ইয়াহিয়া খানের কোনো যুক্তি ছিল না। ১ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৬ জন সদস্যসহ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ-এরও অধিক সদস্য সশরীরে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখে আরো কয়েকজন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বোধনী দিন অর্থাৎ ৩ মার্চের মধ্যে আকাশপথে ঢাকায় আসবেন বলে আশা করা গিয়েছিল।

সব প্রদেশের প্রতিনিধিই ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, এমন কি সিন্ধু এবং পাঞ্জাব থেকেও। সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে বলে ভুট্টো সাহেব দাবি করেন। কেবল পিপিপি ও কাইয়ূমপন্থী মুসলিম লীগের সদস্যগণই অনুপস্থিত থাকতেন। এমন কি এই দুই দলের সকলেই অনুপস্থিত থাকতেন না, কেননা এই দুটি দলের কয়েকজন সদস্য বিদ্রোহের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ শেষ মুহূর্তে তাঁরা ঢাকায় এসে হাজির হতেন।

তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্টের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে তিনি সামরিক আইন আদেশ বলে সংবিধান প্রণয়নের পথে বল প্রয়োগ, বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবন্ধকতা নিষিদ্ধ করে অধিবেশন বর্জনের চেষ্টাকে সহজেই দমন করতে পারতেন। ভুট্টোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি সামরিক আইন অপরাধের আওতায় পড়ে। যে আইনগত কাঠামো আদেশের বিধানের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে তাতেও পরিষদ বর্জনের

হুমকির বিরুদ্ধে আরো প্রতিকারের বিধি ব্যবস্থা ছিল। স্পীকারের কাছে আবেদন না করে যদি কোনো সদস্য পরপর ১৫ দিন পরিষদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁর আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে। এবং "যদি কোনো সদস্য তাঁর নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম অধিবেশনের সাত দিনের মধ্যে অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী শপথ গ্রহণে ও তাতে সম্মতিজ্ঞাপনে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁর আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।"

ভুট্টো যখন তাঁর অধিবেশন বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন, তখন জনগণ প্রত্যাশা করেছিলেন যে, সাত দিনের শর্তের নির্দিষ্ট সময়ের কারণে হয় তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন, নতুবা পরিষদের সদস্য পদে খারিজ হতে বাধ্য হবেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভুট্টোর এ ব্যাপারে কোনো বিবেকের তাড়া ছিল না। তিনি সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে বলেন, 'অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।' পেছনের দিকে দৃষ্টিপাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, সদস্য পদের অযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ভয়ের কোনো কারণই ছিলনা। কারণ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আগেই সে ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। প্রেসিডেন্টের অনুরোধেই অধিবেশন বর্জনের হুমকি দেয়া হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্টও অধিবেশন মুলতবি করে ভুট্টোকে তার প্রতিদান দিয়েছেন। আমি বিশেষ সূত্র থেকে জেনেছি যে প্রকৃতপক্ষে ভুট্টো সাহেব কয়েকজন রাজনীতিবিদদের কাছে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার কথা ২৪ ফেব্রুয়ারি '৭১ বলেছিলেন। ভুট্টো প্রেসিডেন্টের অসন্তোষের মুখে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হতেন। তিনি জাতীয় পরিষদের তাঁর আসনকে কোনোক্রমেই বিপন্ন করে তুলতেন না।

চতুর্থত, অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা প্রেসিডেন্টকে মোটেই বিস্মিত করেনি। ভুট্টোর সঙ্গে স্পষ্ট বন্দোবস্তের কথা ছেড়ে দিলেও একথা জানা গেছে যে, প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে করাচি, পেশোয়ার ও লাহোরের কয়েকজন মৌলবাদী সদস্যকে পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলেন। সে সময় এ সমস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে এমন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত শপথ করে আমাকে একথা বলেছেন। ১৭ এপ্রিলে সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত তাজউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও এর দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভুট্টোর হাত শক্ত করবার উদ্দেশে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াহিয়ার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকজন নেতাকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।'

অধিবেশন মুলতবির কারণ হিসেবে ইয়াহিয়া খান যে ভারত কর্তৃক উত্তেজনা সৃষ্টির কথা বলেছেন সেসবের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রীনগর ও জম্মুর মধ্যে চলাচলকারী একটি ভারতীয় ফকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান ছিনতাই এবং এর পরপরই বিমানটি যে লাহোরে ২৯ জানুয়ারি '৭১ ধ্বংস করে দেয়া থেকেই এসবের সূত্রপাত হয়। যদি বিমানটিকে নিরাপদে ভারতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হত তা হলে কোনো বিপদ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হতো না এবং পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার জন্য একটি অজুহাত সৃষ্টি হতো না।

এটা গোপন নেই যে, পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই ছিনতাই রচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একজন বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে এবং উড়োজাহাজটি লাহোরের মাটি স্পর্শ করার আধ ঘণ্টা আগেই করাচির সংবাদ মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে লোকটি টেলিফোন করেছিল সেখবর দিয়ে দাবি করেছে যে, সে একজন কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধা। এই পরিবর্তনকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কাশ্মীর সমস্যার পুনর্জাগরণ ঘটানোর জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে এ সমস্যা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রথম পাতায় গুরুত্ব পায়। ছিনতাইকারীদের এই উদ্বেগজনক ঘটনা সংকটের কেন্দ্রবিন্দুর ঝালরে পরিণত করা হবে ঃ তারা উড়োজাহাজটি উড়িয়ে দেবে কী দেবে না?

তারপর একটা মীমাংসার প্রস্তাব করা হবে। উড়োজাহাজটি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের বা বিশিষ্ট প্রতিনিধির উপযুক্ত নিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে হস্তান্তর করা হবে। যা থেকে কাশ্মীরকে নিরাপত্তা পরিষদে নতুনভাবে বিতর্কের বিষয় করা হবে। সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়—কেননা স্থানীয় পাঞ্জাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। একজন মধ্যস্থতাকারী ছিনতাইকারীকে ‘বন্ধু হিসেবে আহ্বান করে। যিনি উড়োজাহাজের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনলে, তিনি একজন অত্যুৎসাহী কনষ্টেবল। ভেতরে এই লোকটি জাহাজ উড়িয়ে দেবে বলে আতংকের সৃষ্টি করেছিল। পরে সেই বিস্ফোরণ পাকিস্তান বিদেশ দফতরের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ঘটনাটির অন্ততঃ একটি উপশমের যুক্তি ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। পরবর্তীকালে এটি একটি অভিযোগ হিসাবে ব্যবহার করে শেখ মুজিবকে এই মর্মে হেয় প্রতিপন্ন করা হল যে তিনি শুধু ভারতের প্রতি ‘নরম মনোভাবই পোষণ করেন না’। তিনি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব যা থেকে বিচ্ছিন্নতার ঘটনার নেতৃত্ব পেতে পারে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধানকে ব্যর্থ করার উদ্দেশে এ ধরনের অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না। প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ তার সূত্র মোতাবেক খসড়া সংবিধান আগে পেশ না করবে। তারপর যা কিছু হলো তা শুধু প্রতারণা করার জন্য অজুহাত দেখানো, যেকোনো অজুহাত সৃষ্টি করে প্রতারণা করা।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢালু পাহাড়ের চুড়ায় ওঠার ভয়ংকর প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

পাক-সামরিক বাহিনীর অভিযান

"যিনি তার নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করেন, তিনি গন্তব্যের শীর্ষে আরোহণ করেন।"

—আল-কোরআন

কুমিল্লাস্থ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ডিভিশনের প্রধান দপ্তরের ওপিএস কক্ষের বুলেটিন বোর্ডে উৎকীর্ণ বাণী।

সময়টা ছিল একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অক্লান্ত পরিশ্রমী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বিড়াল ইঁদুরের খেলা খেলছিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব সহজ উপায়ে শীর্ষস্থানীয় পদ অর্জনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেন, কেননা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের পর থেকে প্রেসিডেন্ট তা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পেশোয়ারে পিপিপি নেতার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করার ঘোষণা ছিল দেশের নতুনভাবে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির পরিকল্পিত ফাঁদ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংবিধানিক সমস্যা কেন্দ্র করে যে বিরোধ সৃষ্টি হলো তা পূর্বে অতটা ছিল না। এতে গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে ভুট্টো সাহেবের বিশ্বাসযোগ্যতা একবাক্যে বিনষ্ট হলো। একদিকে এই তরুণ সিন্ধি নেতা আকস্মিক ও সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করে অন্য দিকে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগ দিয়েও সামরিক চক্রের দিকে টেবিলের মোড় ঘুরিয়ে দিতে তাঁর কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হয়নি।

তিনি যতদূর দেখতে পেরেছিলেন, তা হলো, ইয়াহিয়া খান সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তাঁর পদে তিনি ঠিকমতই অধিষ্ঠিত থাকছেন। তিনি যা ভাবেন, তাই করতে পারছেন। তাঁর ফন্দিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে শেখ মুজিবকে খর্ব করে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য একটি কাজের প্রথমে কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন।

এটা ছিল সামরিক বাহিনীর অভিযানের সময়। এসবের জন্য সুস্পষ্ট কারণও ছিল। এটার জন্য পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শক্তি বিশেষ সংখ্যায় বৃদ্ধি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় কর্তৃত্ব বাঙালিরা সবসময় প্রতিরোধ করে এসেছে। সেজন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা দিয়ে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্যদের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে উস্কানী দেয়া হয়েছিল।

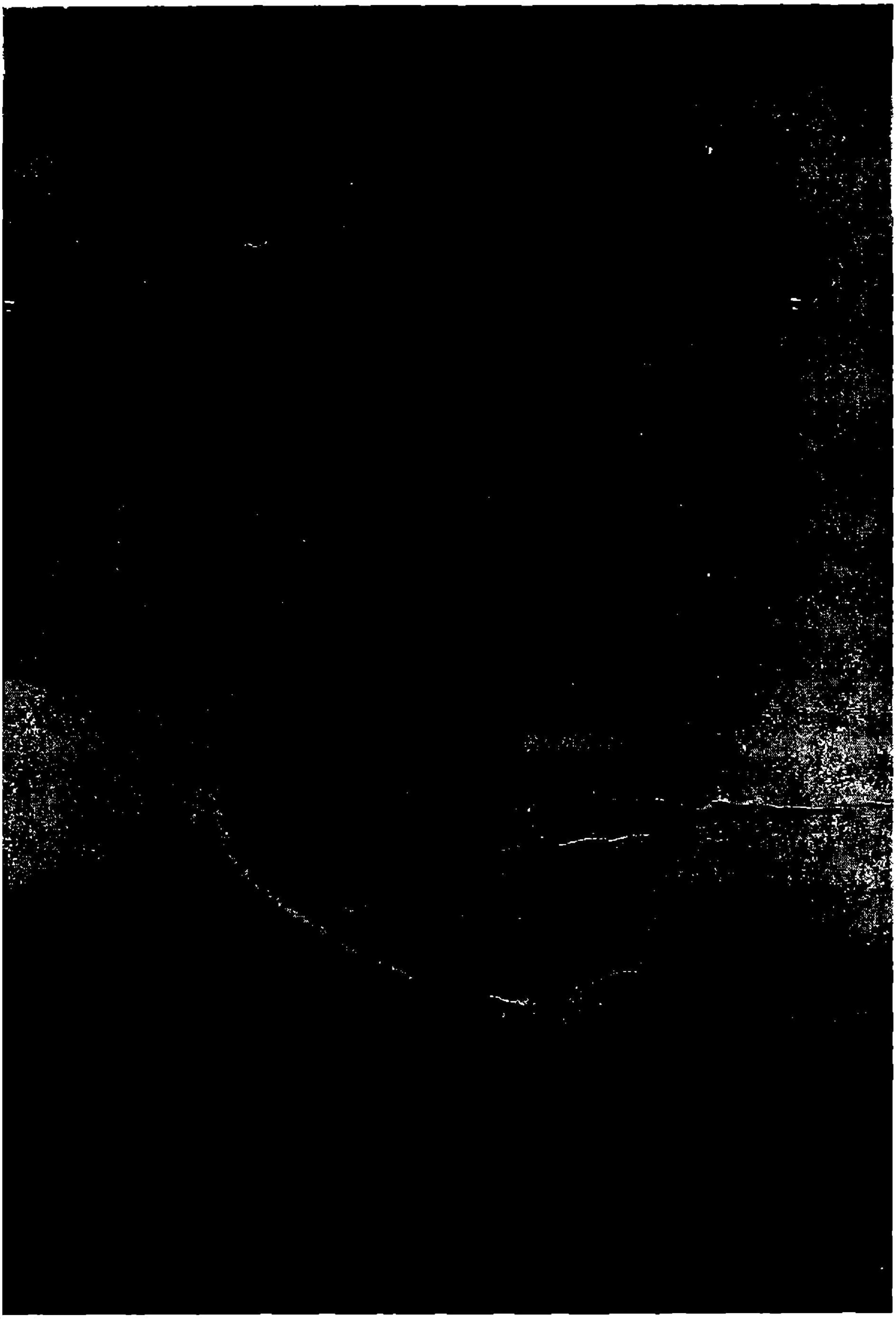

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। জয় বাংলা
—শেখ মুজিবুর রহমান

যে বিভীষিকা ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যে দেখেছে তাতে স্মৃতির কুহরে তোলপাড় করা আতংক তাকে তাড়া করে ফিরছে—এই শরণার্থী সকলের কাছে প্রাণভিক্ষা করছে—ক্ষমা কর বিধাতা।

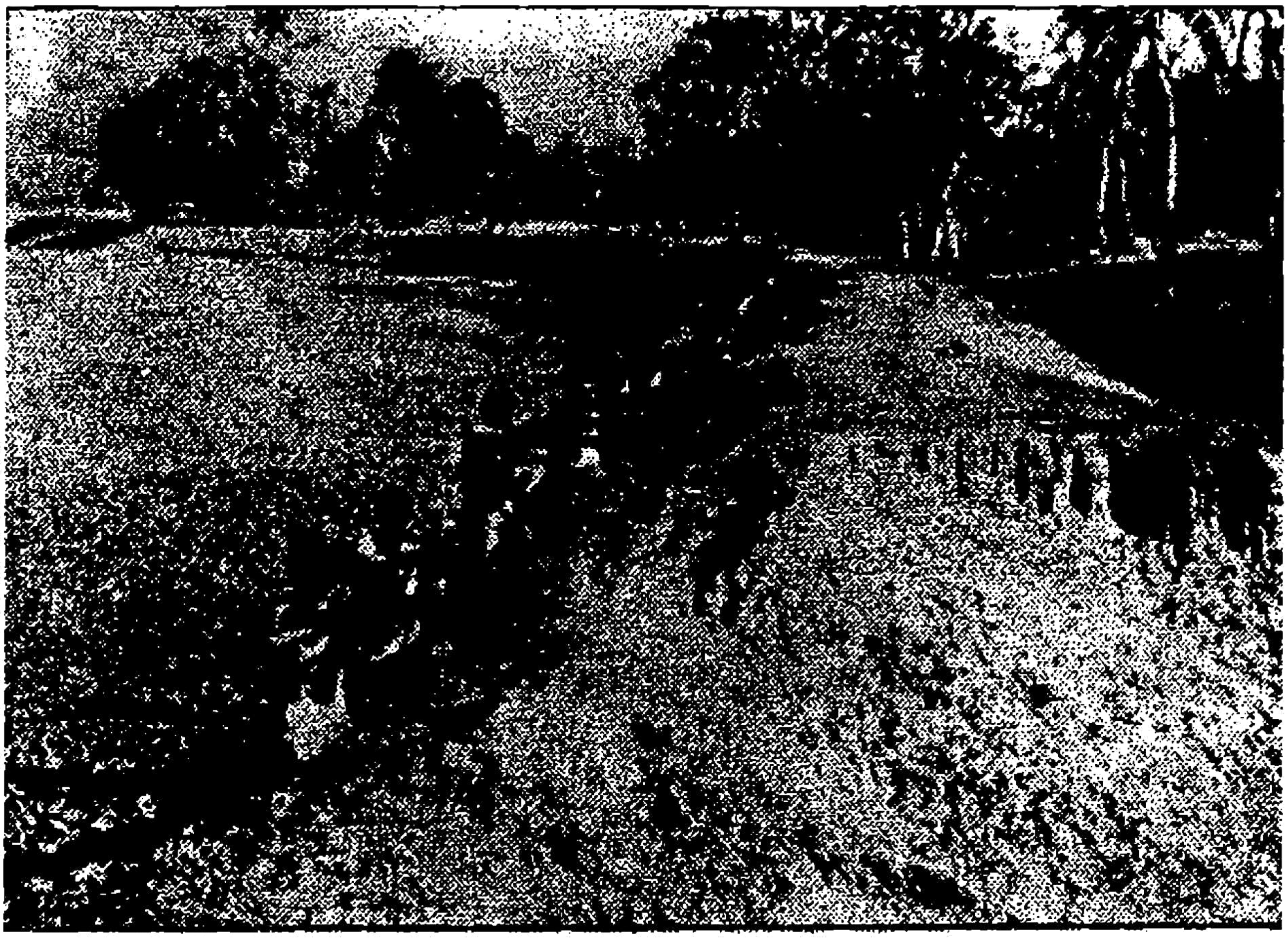

মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি।

নবজাত শিশুকোলে লুটেরার হাত থেকে পরিত্রাণের পর প্রথম নিরাপদ নিদ্রা।

আগরতলা শরণার্থী শিবির : খাদ্যের সন্ধানে ক্রন্দনরত বাস্তুহারা শিশু।

ইয়াহিয়ার শত্রুতার শিকারদের গণকবর।

–মহাকালের সাক্ষ্য

পাকবাহিনী এ মহিলার স্বামীকে হত্যা করেছে। ক্রন্দনরত দেবর ও বিধবা। ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগরূক।

নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং লাহোরে ভারতীয় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ছিনতাই ঘটনা পাক-ভারতের মধ্যে উত্তেজনার গভীরতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বাড়িয়ে দিল। সে অনুসারে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। যাতে পাকিস্তানের উভয় অংশের সীমান্তের বিপদ সামলে নেয়া যায়।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক বিচার বুদ্ধি সঠিক ছিল। তাঁর একটি বিষয়ে ত্রুটি ছিল, তা হলো বাঙালিদের এসবের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভুল হিসেব। অবশ্য, এ ব্যাপারে তাঁর মতে তিনি ঠিকই ছিলেন। ঔপনিবেশিক মানসিকতাসম্পন্ন প্রশাসনের বাঙালিদের প্রতি অন্ধ ঘৃণা ও আক্রোশ—সবসময়ের স্বাভাবিক ত্রুটি ছিল।

ইয়াহিয়া খান গণরায়কে অস্বীকৃতি জানাতে সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছেন। কেননা, যা কিছু ঘটেছে তা প্রেসিডেন্ট ভবনের অভ্যন্তরীণ চক্রের সাহায্যেই ঘটেছে, সেসব আমি আগেই বলেছি। এই গোপন চক্রে প্রধান সেনাপতি ও চার তারকা পদে পদোন্নীত জেনারেল হামিদ খান; প্রেসিডেন্ট-এর প্রধান স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা; কোর কমান্ডার টিক্কা খান, জেনারেল স্টাফের প্রধান লেঃ জেনারেল গুল হাসান; জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ওমর এবং আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল আকবর। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরো দু'জন বেসামরিক ভদ্রলোকও ছিলেন। একজন হলেন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও পাকিস্তানের জাঁদরেল আমলা জনাব এম. এম. আহমদ আর অন্যজন হলেন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জনাব রিজভী। এসব ভদ্রলোকেরা স্পষ্টতঃ ইয়াহিয়া খানের বিশ্বস্ত ও তাঁর অত্যন্ত অনুগত আজ্ঞাবহ ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার ধারণাই সে সময়ে বড় যুক্তি ও আলোচনার বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। এই ধারণাকেই সামরিক বাহিনীর উচ্চপদের কর্মকর্তাদেরকে চাতুরিপূর্ণ খেলার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানানো হলো। এঁরা হলেন পাঁচ প্রদেশের সামরিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকবৃন্দ এবং বিমান ও নৌবাহিনীর সেনাপতিগণ। তাঁরা ছিলেন মোটামুটি সৎ এবং বুদ্ধিমান। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বেসামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের স্বাভাবিক অনীহা ছিল। এঁরা হলেন লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান, তিনি অবিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের গভর্নর। আর অন্যজন হলেন লেঃ জেনারেল রাখমান গুল, সিন্ধুর বর্তমান গভর্নর। আমি এঁদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি এঁদেরকে বাস্তববাদী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বলে জানি। এঁরা অনেক দুরূহ কাজও প্রসংশনীয়ভাবে সম্পন্ন করে থাকেন।

অন্যেরাও তাঁদের মতই ছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এঁদের বাইরে যে লোকগুলো ছিলেন তাঁরা হলেন অন্য জগতের লোক। তারা এসব সামরিক গভর্নরের ধাঁচের বাইরে এমন কি রাওয়ালপিণ্ডির মূল সামরিক প্রশাসন কেন্দ্রের লোকদের চেয়েও ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে লর্ড এটন-এর অনুশাসনবাক্য এঁদের ওপর ফিরে এসেছে।

অভ্যন্তরীণ চক্রের কয়েকজন অফিসার সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনী শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতির কূটনৈতিক মহলের জন্য এরা ছিল একটা জনপ্রিয় বৈঠকখানার দাবা খেলার মতো।

সমস্ত সামরিক বাহিনীর ওপর প্রেসিডেন্টের বিশ্বাসই ছিল একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কাজ। যাহোক এতে যতই মিষ্টি কথার প্রলেপ দেয়া হোক না কেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী রাখার অভিপ্রায়, বেসামরিক সরকার গঠনের আন্দোলনের পথে এগিয়ে গেল। এটা সে সময়ের কতিপয় সামরিক গভর্নরের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আগ্রহের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন ছিল। তখন ঐ ধরনের অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য সামরিক প্রশাসনের সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তানা হলে মতবিরোধ দেখা দিত। এমন কি বিপজ্জনক বিদ্রোহও দেখা দিত যাতে প্রেসিডেন্টও বিপদমুক্ত থাকতে পারতেন না।

ইয়াহিয়া খান এ কাজ করতে পুরোপুরি সামরিক কায়দায় অগ্রসর হলেন। প্রথমত, তিনি বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করলেন। এসব মন্ত্রীদের শুধু উপদেষ্টার ভূমিকাই ছিল। মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ভূমিকা পালনে কোন অসুবিধা হলো না। বিদেশিদের চোখে দোকানের জানালায় সজ্জিত পণ্যের মতো এদের ব্যবহার করা হলো। এঁরা প্রেসিডেন্ট ভবনের বাইরে বিভ্রান্তিকর তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করলেন। মন্ত্রিসভা বাতিল কেবল গোপনীয়তাকেই নিশ্চিত করেনি, বরং সংশ্লিষ্ট কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের কাছেও সামরিক বাহিনী যে কর্তব্য পালন করছে সেটাও বুঝিয়েছে।

এ কাজটি করার পর ইয়াহিয়া খান বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান ও সামরিক গভর্নরবৃন্দ, সামরিক প্রশাসকবৃন্দকে রাওয়ালপিণ্ডিস্থ প্রেসিডেন্ট ভবনের অন্দরমহলে আনুষ্ঠানিক তলব জানালেন। আলোচনার পুরো বর্ণনা এখনও গোপন রয়েছে। তবে লক্ষণে অনুমান করা যায়, পূর্ব বাংলার গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান ও পূর্ব বাংলার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিরোধিতা করেন এবং এ থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যার পরিণতি হবে আরো মারাত্মক সে সম্পর্কে সাবধান করে দেন।

এঁরা দু'জনেই অকুস্থলে ছিলেন এবং বাঙালিদের আন্তরিকভাবে জানতেন কিন্তু তাঁদের কথার গুরুত্ব দেয়া হলো না। সে সময় ছড়িয়ে পড়া গুজবের সত্যতা ছিল অ্যাডমিরাল আহসান পদত্যাগ করেছেন। কেননা তিনি এ ধরনের বিশ্রী ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে চাননি, কিংবা এ খেলার পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভারাক্রান্ত মনে রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করেন। ঢাকাগামী একটি ফ্লাইট ধরার দু'মিনিট আগে তিনি করাচি থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, তাঁকে গভর্নর পদে থাকার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। কেননা এতে সামরিক প্রশাসনের ভাঙনের লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকার সেই পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

পাণ্ডিত্যসুলভ ব্যক্তিত্ব সাহেবজাদা ইয়াকুব খান যার সঙ্গে শেখ মুজিবের ছিল সৌহার্দ্য। তিনি স্পষ্টতঃ ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন। ২ মার্চ ১৯৭১

সালে অকস্মাৎ পূর্ব বাংলার গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান ও পূর্ব বাংলার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এঁদের দু'জনকেই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। ইয়াহিয়া খান এবার তাঁর অভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঐদিনের প্রেসিডেন্ট ভবনের বৈঠকে যা কিছু হোক না কেন, এটা স্পষ্ট বোঝা যায় ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর প্রশাসনের কাছ থেকে যে সাড়া তিনি আশা করেছিলেন বা যা করতে চেয়েছেন তার সর্বাত্মক সহযোগিতা পাননি।

স্পষ্টতঃ সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনে এ ধরনের ধারণা দেয়া হলো যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান যেটা শেখ মুজিবুর রহমান চাচ্ছেন, প্রণীত হলে সামরিক বাহিনীকে পঙ্গু করে দেবে এবং দেশকে বিপন্ন করে তুলবে। কৌশলকে যতটা দুর্বোধ্য ভাবা হয়েছিল আসলে ততটা হলো না। অবশ্য অন্য সব ঘটনা প্রবাহ ইয়াহিয়া খানের অনুকূলে যাচ্ছিল। একটা বিষয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতো ভারতকে। ঐ দেশটির বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনী সর্বদা সজাগ ছিল।

উড়োজাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনা থেকে দুই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা কঠিনতর হয়ে পড়ে এবং ঐ বিষয়ে সর্বাধিক প্রস্তুতির প্রয়োজন দেখা দেয়। সে সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ঘৃণিত শত্রু ভারতের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানান। বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রকাশ্য সমালোচনা ছাড়াও তিনি একথা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর বিবেচনায় দেশ বর্তমান সামরিক সংস্থার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। যদি নির্বাচনী অভিযানকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের পক্ষে সত্যি সত্যি কাম্য হয়। সামরিক বাহিনীর কাছে উভয় দিকের বিবেচনায় শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিল। শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলোর ফেডারেশনের ওপর আধিপত্য করা একটি বিরুদ্ধাচারী সরকার গঠিত হবে, এমন কল্পনাও এই চক্রান্তকারী ব্যক্তিগুলোর নিকট আত্মঘাতী পরিণতি বলে মনে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে যত সহজে হওয়া উচিত ছিল, ঘটনার উপস্থাপনা অত সহজ হওয়ার পর আমার সন্দেহ নেই যে সৎ ও বিচক্ষণ নয় এমন দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারগণ প্রেসিডেন্টের পরিকল্পিত কর্মপন্থাকে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তা সত্ত্বেও এই যুক্তি প্রদর্শন করা যেত যে, প্রেসিডেন্ট কেবল একটি শক্তিশালী সামরিক কাঠামো এবং একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের কোনো সৈনিক স্পষ্টরূপে দেশপ্রেমমূলক এ পরিকল্পনার দোষ ধরতে পারেন কী? নিজের ক্ষমতার ভিত্তিকে নিরাপদ করার পর ইয়াহিয়া খান ও তাঁর দল দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। বড় ঘটনা ঘটবার আর মাত্র ছয়দিন বাকী, কাজেই সময় অপচয় করার মতো সময় নেই। জেনারেল হামিদ, টিক্কা খান ও ওমরকে বিভিন্ন কাজে

ঢাকা, লাহোর ও করাচিতে পাঠানো হলো। বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের তাঁদের চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক দায়িত্ব দেয়া হলো। করাচির সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই নির্দেশ দেয়া হল যে আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগ দফতরের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গতিবিধির খবর প্রকাশ করা চলবে না। এই আদেশ সম্পর্কে কৌতূহলী দৃষ্টি ছিল; কিন্তু কোনো মন্তব্য ছিল না। যদি থাকতো তাহলে ইয়াহিয়ার জন্য তা হতো বিপজ্জনক; কিন্তু দেশের জন্য ছিল কল্যাণকর।

দেশের সর্বত্র সেনাবাহিনীকে একই সময়ে নতুনভাবে সতর্ক অবস্থায় রাখা হলো। এর অজুহাত ছিল ভারতের সঙ্গে উত্তেজনাকর ক্রমঅবনতিশীল সম্পর্ক। একই কারণে বেলুচি রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য ও বিপুল পরিমাণের সমরোপকরণ জাহাজে বোঝাই করে ঢাকাস্থ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হলো। প্রথমে যে জাহাজটি পাওয়া যায়, তা ছিল "এম ভি সোয়াত" নামে একটি মালবাহী জাহাজ, যা শ্রীলংকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণ বোঝাই করার জন্য সেটি রিকুইজেশন করা হয়। ৩ মার্চ যখন জাহাজটি চট্টগ্রামে পৌঁছে তখন বাঙালিরা বুঝলো নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করার উদ্দেশে ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রেরিত এই সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েকদিন বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমান অন্যান্য সেনাদল এবং আরো অধিক রণসম্ভার নিয়ে ঢাকার দিকে একে একে পাড়ি জমাতে থাকে। বিমানগুলো পুরোমাত্রায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ইউনিটসমূহ বহন করে আনে এবং বাঙালি ইউনিটগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়।

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার সঙ্গে বিমান পথে সেনাবাহিনী পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে কর্মরত লোকদের কাছ থেকে হজ্ব টার্মিনালে আকস্মিক সামরিক তৎপরতার খবর জানা যায় টার্মিনালটি সম্ভবতঃ হজ্বের সময়ের বাইরে নির্জন থাকে। সেটি সামরিক বাহিনীর অতিক্রমণ কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ২ থেকে ২৪ মার্চের মধ্যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক ফ্লাইট শ্রীলংকা হয়ে ঢাকা পর্যন্ত ৬০০০ মাইল আকাশ পথ অতিক্রম করে ১২০০০ সেনা বহন করে আনে। শ্রীলংকার কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করতে পারেননি। কেননা বিমানগুলো কেবল যথার্থরূপে টিকেট কাটা সামরিক বেসামরিক যাত্রী বহনের ভান করতো এবং স্পষ্টরূপেই এগুলোকে সেভাবেই দেখানো হতো।

করাচির নৌবাহিনী থেকে বহু বদলির খবর শোনা গেল। এ সমস্ত জাহাজে শতকরা ৭০ জন বাঙালি নাবিক ছিল। শীঘ্রই সে সমস্ত জাহাজে তাদের স্থান অবাঙালিরা দখল করলো। এ সমস্ত টর্পেডোবাহী ক্ষুদ্র নৌবহর তাদের কর্তব্য পালনের জন্য পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম ও মংলার দিকে ধাওয়া করল। করাচির জনপ্রিয় সমুদ্র তীরের নিকটস্থ মৌরীপুর বিমানঘাঁটিতেও বহু তরুণ বাঙালি জঙ্গী বৈমানিক দেখতে পেল যে, তাদের অন্য কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড হেডকোয়ার্টারে কর্মরত বাঙালিরা ব্যাপকভাবে মানুষ ও মালপত্রের স্থানান্তর লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মোটামুটি কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সিনিয়ার অফিসারদের তাড়াতাড়ি ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং দূরবর্তী বেসামরিক কেন্দ্রগুলোতে সাধারণ কাজে নিয়োজিত করা হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিট ঢাকার পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের আবাসিক এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ট্যাংক রাখা হয়েছিল, সেগুলো ঢাকায় নিয়ে আসা হলো। ঢাকায় আনার এক ঘণ্টার মধ্যে সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হলো।

২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে শহরে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিল, যখন একজন মালী এ সংবাদ প্রচার করলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব তাঁর চাকরদেরকে মালপত্র বাঁধা-ছাঁদার জন্য আদেশ দিয়েছেন। লেঃ জেনারেল টিক্কা খান সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩ মার্চ এই সেনাধ্যক্ষ ঢাকা ত্যাগ করেন। এতে মনে হয় দেশে কী হতে যাচ্ছে তা তিনি জানতেন।

লক্ষ্য করা গেছে যে, পূর্ব বাংলার অন্যান্য কেন্দ্রস্থ পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অফিসারদের ছেলেমেয়েদের সাময়িকভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের পরিবারবর্গকে গোপনে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং যে বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী আনা হতো সেই বিমানে করে তাদের পরে করাচিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত সামরিক বৈঠকটিই পাকিস্তানের পরিবর্তনের সূচনা করে। তথাপি এটা অপেক্ষাকৃতভাবে অলক্ষ্যেই ছিল। একথা স্পষ্ট যে, সামরিক সংস্থা তাদের কর্মকাণ্ড ও মনোভাব গোপন রেখেছিল। কিন্তু ১ মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা পর্যন্ত জানা যায়নি, কী অন্যায়ভাবেই না সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালি অনুভূতির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তখন সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল এবং সময় নেওয়ার জন্য এই ঘটনা পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করণের হঠকারী সংগ্রামে পরিণত হয়। এই ঘটনায় ইয়াহিয়া খান নিজেকে একজন ধূর্ত সেনানায়ক হিসাবে প্রমাণ করলেন। তিনি রাজনীতিবিদদের অবিরাম আলাপ-আলোচনায় আবদ্ধ করে তাঁদের সন্দেহ দূর করলেন, ইত্যবসরে পূর্ব বাংলায় সামরিক শক্তি দ্বিগুণ করা হলো তারপর নিজের পছন্দমত সময়ে ও স্থানে তিনি মরণ আঘাত হানলেন।

কুমিল্লায় মেজর বশির অপারেশনের ক্রোড়পত্র সরবরাহ করেন। তিনি খোলাখুলিভাবে শ্রদ্ধামাখা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'আমি কখনো আপনাদের কাছে বলতে পারিনি, কীভাবে এই মহৎ ব্যক্তিটি (জেনারেল ইয়াহিয়া খান) আমাদের রক্ষা করেছেন।'

অবিস্মরণীয় পঁচিশ দিন

'এমন কী গান্ধীজীও বিস্মিত হতেন?'
-খান ওয়ালী খান

পূর্ব বাংলার অন্যান্য দিনের মতন একাত্তরের মার্চ মাসের পহেলা দিনটিও গতানুগতিকভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল। ঢাকার রাস্তাঘাটে প্রতিদিনের মতো হকার, দোকানদার, ভিক্ষুকের ভিড় ছিল। অপরিহার্য সাইকেল, রিকশা এবং অন্যান্য যানবাহনগুলো নির্বিকার আমেজে চলাচল করছিল। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সদরঘাটে দেশি নৌকা এবং লঞ্চগুলো ব্যস্তযাত্রী পারাপারের হৈ চৈ-এ মত্ত ছিল। ঢাকা ক্লাবের লাউঞ্জগুলোতে বুট শার্ট পরা ব্যবসায়ী আর লিলেনের স্যুট পরা সরকারি কর্মচারী আলুর চাট এবং মাছের সুস্বাদু খাবার হাতে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গুলজারে মত্ত ছিল। শহরের রাস্তায় যেখানে সেখানে আনারস বিক্রেতা এক আনায় রসাল সুস্বাদু ফলের ফালি বিক্রি করছিল।

তখনই একটা সংবাদের বোমা বিস্ফোরিত হলো। এটা ছিল বাংলাদেশের কাছে হিরোশিমার চেয়েও ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণ।

এটা ছিল অনির্ধারিত সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের বৈঠক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রচারিত মুলতবি ঘোষণার এক রেডিও বিবৃতি। এই প্রথমবারের মত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এই অধিবেশন মাত্র দু'দিন পরে অর্থাৎ ৩ মার্চ শুরু হতে যাচ্ছিল। বিবৃতিটি ছিল তালগোল পাকানো যুক্তি সর্বস্ব, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আর পাকিস্তানের জাতির জনক মি. এম এ জিন্নাহর নামে আবেদন। কিন্তু এ ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কোনো নতুন তারিখের উল্লেখ ছিল না। বাঙালিদের কাছে এটা কোন বিস্ময়কর ঘটনাই ছিল না। তারা এটুকু ভাবতে পেরেছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরেকবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো। এটা চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ এবং এই কাজের পরিণতি হলো যুদ্ধ ঘোষণা করা। এটাকে যাই বলা হোক না কেন অনুভূতিতে এটা ছিল এই ধরনের। বাংলাদেশ একটা পৃথক গন্তব্য খুঁজে পেতে চায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাই-ই চাচ্ছেন।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দোকানপাট, অফিস-কাচারি, রেস্তোরাঁ, বাজারঘাট সব জনশূন্য হয়ে পড়লো। মিটিংয়ের কোনো ঘোষণা ছিল না বা তার কোনো সময়ও ছিল না। অথচ সারিবদ্ধ জনতাকে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। জনতার মুখে আক্রোশের ছাপ, হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হকিস্টিক, এমন কি নারকেলের পাতাবিহীন ডগা পর্যন্ত।

এই আক্রোশের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ দেখে বিদেশিসহ পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিস্মিত হয়েছিল। এ আক্রোশের তীব্রতা এমন ছিল যে হাজার অরাজকতা সৃষ্টিকারীরা হাজার হাজার বাক্য বিষ ছড়ালেও অতটা বিস্ময় প্রকাশ পেত না। ঢাকার এ বিক্ষোভ ও আক্রোশের ঘটনা প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুরণন তুললো।

সেদিনই বিক্ষুব্ধ বাঙালির হৃদয়ে বাংলাদেশের জন্ম হলো।

বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে ময়দানে পঞ্চাশ হাজার জনতা সমবেত হয়েছে। তখনও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীগণ হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকে আলোচনা করছিলেন।

'জয় বাংলা' শ্লোগানসহ ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর নামে মুহুর্মুহু মুর্দাবাদ শ্লোগানে চারদিকের আকাশ বাতাস উদ্বেল হয়ে পড়েছিল। জনৈক ছাত্রনেতা মাঝে মাঝে ওপরে উঠে স্বাধীনতা এবং 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা' সম্পর্কে জনতার উদ্দেশে উচ্চৈস্বরে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছিলেন।

ইতিমধ্যে পূর্বাণী হোটেলের বাইরের প্রাঙ্গণটি আক্রোশে ফেটে পড়া জনতায় ভরে গেল। তাদের মুখে ছিল "জয় বাংলা"সহ বিভিন্ন শ্লোগান ও স্বাধীনতার দাবি। কোনো একজন পাকিস্তানি পতাকা যোগাড় করে আনলে, জনতা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সেটাকে পুড়িয়ে ফেললো। কাছের পিআইএ অফিসের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ফেললো। কয়েকজন ফচকে ছোকরা হোটেলের প্রবেশ পথে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের দোকান লুট করতে চেষ্টা করলো।

জনতার আক্রোশ নাগালের বাইরে যেতে চলেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। জনতা শান্ত হলো। তিনি সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত বক্তব্য রাখলেন। ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারা প্রদেশে ধর্মঘট পালিত হবে। তিনি জনতাকে একথাও বললেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। একথা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বারবার আহ্বান করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান তা মেনে নেননি বরং জনতার আহ্বান তখনও এড়িয়ে গিয়েছেন।

সে রাতে ঢাকা শহরের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। কিছু সংখ্যক অবাঙালি ও তাদের সম্পত্তির ওপর আক্রমণের ঘটনাসহ কয়েকটি অগ্নি সংযোগের ঘটনার কথা জানা গেল। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে গেলে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নাজেহাল হতে হয়। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লো। সেখানে সংঘটিত ক'টা দুর্ঘটনার সংবাদ জানা গেল।

এটা হইল পঁচিশ দিনব্যাপী গণবিক্ষোভের সূচনা, তার নজির পাকিস্তানে মেলে না। সেনাবাহিনী কখনো এ জাতীয় গণবিক্ষোভের আশা করেনি। শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানালেন। পরদিন ঢাকা নগরী তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। জীবনযাত্রা নিশ্চল হয়ে পড়লো। সমগ্র রাজপথ ধরে শুধু জনবিক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধ জনতার

সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনা মূল্যায়ন করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা নিয়মিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ধরনের আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য রাখতো না। সে কারণে সন্ধ্যা সাতটা থেকে বার ঘণ্টার কার্ফু বা সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হলো।

এ যেন বাঁশের ঝাঁপি দিয়ে ঝড়ের গতি রোধ করা। ঢাকা শহরে সর্বত্রই সান্ধ্য আইন লঙ্ঘিত হলো। টহলরত সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুলি চালালো। বেশ ক'জন মারা গেল কিন্তু নিরস্ত্র জনতা খালি হাতেই সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বাঙালিরা এবার তাদের সাহস ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেখাতে থাকলো।

৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। ইতোমধ্যে প্রদেশের অন্যত্র এই বিক্ষোভের জোয়ার লেগেছে। দু'একটা বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা চলতে থাকলেও দেশের সর্বত্র জনগণ শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দেয়, আন্দোলন আরো সংহত ও নিয়মতান্ত্রিক পথে এগিয়ে চললো। যখন কার্ফু আর কার্যকর করা যাচ্ছে না তখন সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়া হলো, ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এলো। আওয়ামী লীগের নির্দেশে খাদ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ সেনাবাহিনীর জন্য বন্ধ করে দিলে, সেনাবাহিনীও ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে লাগলো।

ঐ রাতে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে আগত 'এম ভি সোয়াত' থেকে সৈন্য এবং গোলাবারুদ নামাতে চেষ্টা করলে মারাত্মক গণ্ডগোল দেখা যায়। ডক শ্রমিকরা এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দিল। শীঘ্রই হাজার হাজার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ও নাবিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো। গণ্ডগোল নতুনরূপ ধারণ করলো, যখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একটি ইউনিট বাঙালি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলো। জানা গেল ৭ জনকে কোর্ট মার্শাল দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে গুলি করে মারা হয়েছে। এই ঘটনা বাঙালিদের বিক্ষোভের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল।

অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির ওপর আওয়ামী লীগের মনোভাব কঠোর হতে আরম্ভ করলো এবং উপর্যুপরি হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশের সকল কর্মতৎপরতা পঙ্গু হয়ে গেল। ৩ মার্চ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে অপরাহ্ণ ২টা পর্যন্ত অবিরাম হরতাল পালনের নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশানুসারে প্রতিদিন এই প্রদেশের ঐ সময়ের জন্য সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। সরকারি অফিস, আদালত, ব্যাংকের দরজা হলো বন্ধ। এমন কি ডাক ও তার, বিমান, ট্রেন পর্যন্ত অচল হয়ে পড়লো। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর ও অন্যান্য সেনানিবাসে রেশনের স্বল্পতার জন্য সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া হলো। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালিরা কোনক্রমেই সেনানিবাসের কাজে সহায়তা করতে রাজি নয়।

এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অপসারিত গভর্নর আহসানের স্থলাভিষিক্ত হতে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় এসে পৌছলেন। বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে টিক্কা খানের পুরনো অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে বেলুচিস্তানের কসাই নামে সুনাম অর্জন করেছেন। কয়েক বছর আগে তিনি কঠোর হস্তে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমন করেছেন। এবার তিনি পূর্ব বাংলায় একই ধরনের কাজ করার জন্য দায়িত্বে এসেছেন। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। সেজন্য গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক এই দ্বৈত ভূমিকা তাকে দেয়া হয়েছে।

টিক্কা খানের উপস্থিতি যা হোক, সরকারের পক্ষে কোনো উন্নতিই হলো না বরং এতে অবনতি ত্বরান্বিত হলো। বাঙালিদের বিক্ষোভ ও অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হলো।

সরকারি কাজকর্ম প্রদেশের সব স্থানেই বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষতঃ যে ঢাকা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই। সরকারি দফতর এবং অন্যান্য বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানি পতাকার স্থলে কালো পতাকা উড্ডয়ন করা হলো। শেখ মুজিবের নির্দেশে ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোতে আদেশ অমান্য করে পাকিস্তানি জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে বাংলা দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতে লাগলো। এ সকল দফতরের কর্মচারিগণ সরকারি চাকুরি বিধি লঙ্ঘন করে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার নির্দেশ মেনে চলতে লাগলো।

প্রতিদিন বিকেল ২টা পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়ার পর স্টেডিয়াম ও অন্যান্য জায়গায় জনসভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এইসব সভায় ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখতেন। এই বক্তৃতামঞ্চ থেকে শেখ মুজিবের আদেশাবলি তাদের মাধ্যমে ঘোষিত হতো। এক সুযোগে ৩৪১ জন কয়েদি ঢাকা জেল ভেঙ্গে স্টেডিয়ামের জনসভায় এসে উপস্থিত হলো এবং কয়েদীদের উর্দিপরা অবস্থাতেই তারা রাস্তায় শোভাযাত্রায় সামিল হলো। কর্তৃপক্ষ এ দৃশ্য অসহায়দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আন্দোলনের গতি তীব্রতর হতে থাকলো, স্বাধীনতার দাবির ব্যাপকতা বেড়ে চললো। সে কারণে সকলের দৃষ্টি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে নিবদ্ধ থাকলো, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন বলে সকলেই আশা করছেন। এসব ঘটনা রাওয়ালপিন্ডির সামরিকচক্রকে অসহিষ্ণু করে তুললো। তারা স্পষ্টতঃ বাঙালির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে ভুল হিসেব করল। অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানো সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি প্রচণ্ড গণবিদ্রোহ দমনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তা'ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো। এরাই পূর্ব বাংলায় সামরিক শক্তির চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে আসছে। সবকিছুর উর্ধ্বে দেখা দিল স্বাধীনতার জন্য আসন্ন ঘোষণার হুমকি।

নিঃসন্দেহে এই সমস্যা সকল আশার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট সত্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ দমনের যে পরিকল্পনা ছিল যাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে শক্তি প্রয়োগে বশীভূত করবে, এখনকার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো নির্মমভাবে গণবিদ্রোহের

মূলোৎপাটন করা। রাজনৈতিক বিকল্পগুলো প্রেসিডেন্টের মনকে এতটুকু ভারাক্রান্ত করেনি। কারণ সেসবের মধ্যে ছিল পরাজয়কে মেনে নেয়া। সেজন্য ইয়াহিয়া খানের পক্ষে আর পিছনে ফেরার উপায় থাকলো না। তিনি বৃহত্তর শক্তি প্রয়োগের তথা সামরিক সমাধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সুরাহার পথ দেখলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরাও প্রেসিডেন্টের এই মনোভাবকে সমর্থন করলেন। অকুস্থল ঢাকায় যে ব্যক্তিটি ছিলেন সেই টিক্কা খান আরো উৎসাহী ও আগ্রহ দেখালেন। টিক্কা খান প্রেসিডেন্টকে জানালেন, 'আমাকে আরো ক্ষমতা দিন, আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওদেরকে ঠাণ্ডা করে দেব।' প্রেসিডেন্ট এ যুক্তির কোনো ত্রুটি দেখতে পেলেন না। প্রেসিডেন্টের এটা ধারণার অতীত ছিল যে, বাঙালিরা দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। অতএব দাবার চাল ছুঁড়ে দেয়া হলো। সামরিক বাহিনীকে যেকোনো মূল্যে তার অবস্থান বজায় রাখতেই হবে। বাঙালিদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে।

৫ মার্চের বিকেলে ইয়াহিয়া খানের মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কর্মপন্থার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৌশল হবে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি যোগানো, প্রস্তুতির জন্য সময় নেয়া এবং উপযুক্ত সময়ে মরণ ছোবল দেয়া। সে অনুযায়ী তিনি আকাশ পথে রণসম্ভার পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। আনুষঙ্গিক যুদ্ধ আইন আদেশ জারি করা হলো। পরদিন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন যে, যেহেতু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কারণে ভুল বুঝাবুঝি ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের চিৎকারে পরিণত হয়েছে। সেহেতু তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার মীমাংসাকল্পে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হইল।

আমার মনে হয় না যে, তিন বা চার কোটি পাকিস্তানি যারা সেদিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনেছেন তাঁরা সেদিনকার সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। বাস্তবক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান জনদাবির প্রত্যুত্তরে এটা জানাতে পারতেন। কিন্তু বক্তব্যে তিনি যে ধাঁচের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে সুরে বলেছেন, তাতে তাঁর মনোভাবে দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে একজন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানের এ ধরনের রাজনীতিবিদদের সৃষ্ট জটিলতা থেকে মুক্ত করার কথা হয়তো ভাবা যেত। কিন্তু প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে আসল চাপটা সেদিকে ছিল না। তিনি বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের অনুভূতির জন্য একটি কথাও বলেননি বা সামান্যতম সান্ত্বনা বা লাঘবের উদ্যোগও নেননি। তাঁর পরিবর্তে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি এক হাতে যা দিতে চেয়েছেন অন্য হাতে তা কেড়ে নিয়েছেন। আমার এক শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মীর উক্তি 'তিনি (ইয়াহিয়া) মোটেও আন্তরিক নন এবং তিনি পাকিস্তানকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন'–এটা করাচিতে আমার সহকর্মী ও আমার অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি।

এ থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা গিয়েছিল যে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের অস্ত্রকে ভোঁতা করে দেবার একটা প্রচেষ্টা। কেননা তিনি ভেবেছিলেন ঐ দিন শেখ মুজিব

স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। এটা ছিল তাঁর একটা উদ্দেশ্যমূলক জুয়াখেলা। অন্ততঃ এবারে ইয়াহিয়া খান ভুল হিসাব করেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং তাঁর দলের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই ফাঁদে আটকা পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব স্বাধিকার অর্জনের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বলে ঘোষণা দিলেন। জনগণের প্রত্যাশিত ঘোষণা সরাসরি পেল না সেজন্য অনেকে হতাশ হলো। এই আন্দোলন ইয়াহিয়া খান চক্রের কাছে যতই ধবংসাত্মক ও অপ্রিয় হোক না কেন, এটা সামরিক প্রস্তুতির জন্য তখনো আকাঙ্ক্ষিত সময় দিয়েছিল।

বিপ্লবী নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি চার মাইল দূরে পূর্বাঞ্চল সেনানিবাসের প্রধান দপ্তরে লক্ষ লক্ষ দৃঢ়চেতা বজ্রমুষ্টি বাঙালিদের নেতৃত্ব দিয়ে টিক্কা খানকে আত্মসমর্পণ করাতে পারতেন। বাঙালিরা তা করতে প্রস্তুত ছিল, সামরিক বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য কয়েক শত আত্মাহুতিও দিতে প্রস্তুত ছিল। তাহলে বাংলাদেশ সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হতে পারতো। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, অজস্র লোকের বাস্তুহারা ও সামরিক নৃশংসতার শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে হতো না।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অজ্ঞতার পরিচয় এবারই শুধু একবার দেয়নি। তাঁদের চোখ ও কানের সম্মুখে অসংখ্য বেদনাদায়ক সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইয়াহিয়া খানের চালে বোকা বনে 'ম্যাড হাট্টার' নাচের 'সাংবিধানিক সূত্রের আলোচনায়' অংশ নিলেন এবং পরিণতিতে জনগণকে মেষের মতো কসাই পাকসেনার হাতে জবাই হতে হলো।

২৫ মার্চে চরম আদেশ প্রদানের পর ইয়াহিয়া খান যখন করাচিতে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদল ঢাকা ও চট্টগ্রামে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন একজন আওয়ামী লীগের পত্রবাহক শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজ দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করছিলেন। এই প্রেস রিলিজের বক্তব্য ছিল যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতৈক্যে পৌঁছেছি এবং আশা করি প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণা দেবেন (এখানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আমি ব্যবহার করেছি–কেননা এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমার কোনো মন্তব্য নেই)।

৩ থেকে ২৫ মার্চে বাঙালি সেনারা তিনবার পৃথকভাবে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে নির্দেশ চেয়েছেন, কেননা যা ঘটবে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো সংশয় ছিল না। প্রতিবারই শেখ মুজিব বাঙালি সেনাদের সঙ্গে সময়োপযোগী ব্যবহার করেছেন বা মামুলি ধরনের কথাবার্তা বলেছেন। আমার মনে হয় না ঐসব সাহসী আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণ যাঁরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ঐ অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। যা হোক রাজনীতিবিদরা যতই তাদের পেছনে চাপার চেষ্টা করুণ না কেন এই

লোকগুলো এবং তাদের মতো সাহসী ছাত্রবৃন্দ যাঁরা এখন তাদের সঙ্গে থেকে লড়ছেন তাঁরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত বীরযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত থাকবেন এবং ঘটনাক্রমে এঁরাই নতুন প্রজাতন্ত্রের রক্ষক হবেন। ৭ মার্চের ক্ষমতা দখলের সুযোগের ব্যর্থতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতধর্মী কাজ। আমি তাঁকে বহু বছর ধরে কাছে থেকে জানি। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মের দিনে ফ্লাগস্টাফ আরিজোনা, লস এঞ্জেলস এবং সানফ্রান্সিসকো হোটেলের কামরাগুলোতে একসঙ্গে থেকেছি। আমি তাঁকে হুবহু স্মরণ করতে পারছি। তিনি ১৯৫০ সালের একজন সাহসী ছাত্রনেতা এবং ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর বালুচ রেজিমেন্ট মেসে যেদিন আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের শাসনভার দখল করলেন, ঐদিনে তাঁর সঙ্গে আলোচনার কথা আমার বেশ মনে আছে।

পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদদের শঠতায় অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নূনের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেন, “আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।” তিনি আরো বলেন, “আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখবো।” কয়েক ঘন্টা পর যখন তিনি ঢাকার উদ্দেশে আকাশপথে যাচ্ছিলেন আইয়ুব খান তখন দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন এবং শেখ মুজিব শিগগিরই আবার কারাগারের প্রকোষ্ঠে নিজেকে দেখতে পেলেন।

১৯৭১ সালের মধ্যে এই তীক্ষ্ণধী বাঙালি নেতা, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির চালে যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সেই পাক সামরিকচক্রের ভূমিকা সংযত করার পরিবর্তে আলগা করেছিলেন। আমি আইয়ুব খানের মন্তব্য উল্লেখ করছি ঃ

“মুজিবের ব্যর্থতার কারণ তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে নিহিত নয়, তা নিহিত রয়েছে বাস্তব পরিস্থিতির সম্পর্কে তার জ্ঞানের মধ্যে, যার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন—। এটা ছিল রাজনীতির সঙ্গে তার নিবিষ্ট-চিত্ততা, যা তাকে তৎপ্রবর্তিত আন্দোলনের ব্যাপকতর সামাজিক সংশ্লেষের বিচার থেকে তাকে নিবৃত্ত করেছিলো।” *(বাংলাদেশ ঃ এ স্ট্রাগল ফর নেশনহুড, পৃষ্ঠা-৬২)*

এবার ৭ মার্চের কথায় ফিরে আসছি। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভা—বাঙালিদের সংগ্রামের একটি নাটকীয় মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু জনগণ যা আশা করেছিল তা হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য একটি কর্মসূচি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত দশ লক্ষাধিক লোক জানতে এসেছিলেন অন্য কিছু ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমগ্র পূর্ব বাংলা আক্রোশে ফেটে পড়েছিল। ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের সভাগুলোতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালিরা পরিস্থিতির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসার পথ নেই। ছাত্রনেতাগণ, বাস্তব পরিস্থিতির

প্রতি ছিলেন স্পন্দনশীল, তারা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। তারা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য চরমপত্র দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শোনার জন্য জনসাধারণ রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়। এবং তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা জানাতে তারা সঙ্গে শর্টগান, তরবারি, ঘরের তৈরি বল্লম, বাঁশের লাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। সেদিন একটি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর কোনো লোকও দেখা যায়নি।

সেনাদলের উপস্থিতির নিদর্শন একটি মাত্র সবুজ পিঙ্গল বর্ণের হেলিকপ্টার, যা গাছের ওপর দিয়ে অবিরামভাবে উড়ছিল। সেনাবাহিনীর ঐরূপ উপস্থিতিতে কিছু লোককে বিচলিত করতে পারে এই আশায় হেলিকপ্টারটি উড়লেও জনগণকে মোটেই বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ সেদিনের জন্য হেলিকপ্টারের আরোহীরা আরো ভীত হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ দূর থেকে সেদিন জনসমুদ্রে যে দৃঢ় প্রতিবাদ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা তাদের মারাত্মক দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। যদি এই জনসমুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করত, তাহলে ট্যাংক কিংবা কামান-বন্দুক নিয়ে তাদের নিস্তব্ধ করা সম্ভব হতো না। এই বিপদের কথা টিক্কা খান ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। হেলিকপ্টারটির চক্কর মারার কারণও ছিল তাই।

ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সভামঞ্চের ওপর, যেখানে যেকোনো মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছিল ('বঙ্গবন্ধু' বাঙালিরা সবাই শ্রদ্ধা ও আদরের সঙ্গে এ নামে শেখ মুজিবকে ডেকে থাকে) সভায় উপস্থিত হতে বঙ্গবন্ধু বিলম্ব করছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন দলের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় রত ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্ট যে নতুন তারিখ ঘোষণা করেছেন, তা বিবেচনার জন্য তাঁর বাসভবনে আগের দিন সন্ধ্যায় এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। জনগণ উচ্চৈস্বরে দাবি করে আসছে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সে বিষয়েও আওয়ামী লীগের সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও কথা ছিল। এর জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল। একদিকে ছিল শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের হুমকি আর চাপ দেয়া হচ্ছিল যে আওয়ামী লীগের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা। এদের সঙ্গে ছিল রাজপথে জনগণের দাবির চাপ—এ দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কসাই টিক্কা খান পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় বর্বরোচিত প্রতিশোধ গ্রহণের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে নিরীহ লোকদের জীবনহানি ঘটবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। শেখ মুজিব রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন। তারপর তাদেরকে বিপদের ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। কেননা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য তারিখ নির্ধারণ স্পষ্ট আত্মসমর্পণ। এটা তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, দু'বছর আগে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের যে পরিণতি ঘটেছিল ইয়াহিয়া খানও অনুরূপ

পরিণতির শিকার হবেন। প্রেসিডেন্ট সঠিকভাবে আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধ মাত্রই অন্যায় মনোভাবের লোকদের কাছে প্রবল আবেদন জাগাবে। কেননা তারা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে বিজয়ের রসাস্বাদনের আশা করছেন।

সারা রাত এবং দিনের একটি বিরাট অংশ ধরে আলাপ-আলোচনা চললো। তথাপি আওয়ামী লীগ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলো না। স্পষ্টতঃ তারা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে কেননা তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। অবশেষে মুক্তির প্রকাশ্যভাবে বলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বললেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে চার দফা দাবি পেশ করবেন এবং প্রদেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করবেন, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালিদের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করবে।

এই চার দফা হলো ঃ

(১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;

(২) সামরিক বাহিনীর লোকদের অবিলম্বে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে;

(৩) নিহতদের জন্য তদন্ত করতে হবে; এবং

(৪) অবিলম্বে অর্থাৎ ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

দাবিগুলো ছিল সমঝোতা জাতীয়। এগুলোর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয় থাকবে—যেমন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, কিন্তু এর পদ্ধতি হবে অহিংস।

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তার হাতে জনগণের ক্ষমতারূপ শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায়কে সঠিকভাবে বুঝতে তিনি হিসেবে ভুল করেছেন এবং সেজন্যই তিনি তাঁর চরম অস্ত্রের ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলেন।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি শেখ মুজিবের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করতে দ্বিধা করেনি। স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থা আরেকটি মধ্যপন্থা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু বাইরে অপেক্ষমান ছাত্রনেতাগণ সে সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্পষ্টতঃ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দৃশ্যতঃ তেমন ফল হয়নি।

শেখ মুজিব একজন বজ্রকণ্ঠী বক্তা। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় তিনি সবকিছুই ব্যবহার করেছেন—যথার্থ শব্দের মূর্চ্ছনা, তীব্র শ্লেষ বজ্রকণ্ঠের মন্ত্রপূত আহ্বান কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে সে সময়ের জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না। বক্তৃতার সময় জনতা উত্তেজনায় মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছিল এবং যথার্থ স্থানে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, তথাপি জনগণের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তা নিশ্চয়ই ঘটনার উপযোগী হয়নি। বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বিরাট জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে জনতার নৈরাশ্যভাবে উপলব্ধি করলেন।

এবার তিনি আবার বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি উত্তোলন করে বজ্রকণ্ঠে উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঃ 'আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' "জয় বাংলা।"

জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা যে জন্য এসেছিল, ঠিক তা তারা পায়নি। কিন্তু শেখ মুজিব তো মুক্তি এবং স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এই মনোভাব নিয়েই তারা ময়দান থেকে চলে গেল এবং আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচিতে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো।

পরদিন সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলো ছাড়া পূর্ব বাংলার সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেল। জনগণের শাসন প্রবর্তিত হলো। জনগণ ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের কর পরিশোধ করা বন্ধ করে দিল। ৩ মার্চে প্রদত্ত শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙালি মালিকানাধীন দুটি ব্যাংকে যাবতীয় অর্থ জমা হতে লাগলো। এখন সরকারি কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অবাধ্যতা লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার লাভ করলো। এ ব্যাপারে বাঙালিরা ছিল চরম মাত্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত। প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করাকে ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলী পালন করছিল। এ জাতীয় শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের দৃশ্য আর কখনো দেখা যায়নি। এ কারণেই অহিংস আন্দোলনের আজীবন ভক্ত খান ওয়ালী খান বলেছেন, 'এমন কি গান্ধীজীও বিস্মিত হতেন।'

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের যে দশটি নির্দেশনামা জারি করা হয় সেগুলো নিচে দেওয়া হলো। কারণ এসব নির্দেশনামা থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠবে।

শেখ মুজিব বলেছেন ঃ

(১) সরকারের সকল প্রকার কর প্রদান বন্ধ থাকবে।

(২) বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও আধাসরকারি দফতরসমূহ, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতসমূহ সহ বাংলাদেশে হরতাল পালিত হবে। হরতালের আওতা থেকে যেসব বিষয় অব্যাহিত দেয়া হবে তা সময় সময় ঘোষণা দেয়া হবে।

(৩) রেলওয়ে এবং পোর্টে কাজকর্ম চলবে, কিন্তু রেলওয়ে এবং পোর্টে সামরিক বাহিনীর চলাচলের মাধ্যমে যদি জনগণের ওপর নিবর্তনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে কোনো কর্মচারী সহযোগিতা করবে না।

(৪) রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে। এবং কোনোক্রমেই জনগণের আন্দোলনের সংবাদ চাপা দেয়া যাবে না। যদি তা করা হয় তাহলে বাঙালি কর্মচারীরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।

(৫) শুধুমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা টেলিফোন ও ট্রাংকল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(৬) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

(৭) স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার করতে পারবে না।

(৮) সকল প্রতিষ্ঠানে বা ভবনে প্রতিদিন কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে হরতাল তুলে নেয়া হলো। তবে প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার হরতাল ডাকা হবে।

(১০)প্রত্যেক ঘরে ঘরে, ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ (বিপ্লবী কাউন্সিল) গড়ে তুলতে হবে (এটা সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো এমনকি নিম্নস্থানীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)।

৮ মার্চ যখন এ সমস্ত নির্দেশ পালিত হলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে দারুণ ভীতির সঞ্চার হলো। করাচির স্টক একচেঞ্জ বিশেষ করে যে সমস্ত কোম্পানির মূল কেন্দ্র পূর্ব বাংলায় সেগুলোর শেয়ার মূল্য দ্রুতগতিতে নেমে গেল। বড় বড় শেঠরা অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা এখন কী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা তাদের মিলগুলো দেখা শুনার জন্য লোক পাঠিয়ে বিপদে পড়বে? নাকি পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য করাচিতে থাকবে। এদের দুই একজন পূর্ব বাংলায় সাময়িকভাবে চলে এলো। অন্যরা করাচিতে থেকে রাওয়ালপিন্ডির সরকারের কাছে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে লাগলো। একজন শেঠ একজন বাঙালি কর্মচারীকে চার গুণ বেতন দিতে চেয়ে বললো পূর্ব বাংলায় গিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেখাশুনা করো। এ ধরনের প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে আমি জেনেছি। আমার একজন বিশিষ্ট বাঙালি বন্ধু তার দুই ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে যান যাতে তারা স্বচক্ষে 'আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় প্রত্যক্ষ করতে পারে'। ৮ মার্চে পাকিস্তানের দৃশ্য ছিল এইরূপ।

সরকারি অফিস ও ব্যাংকের প্রতি নির্দেশাবলী বোধগম্য কারণেই জনসাধারণের কাছে বেশ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং খাদ্যশস্য এবং অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চলাচলও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হলো। রপ্তানী, যা ছিল দেশের অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তা বন্ধ হয়ে গেল। তাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা (বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ৮ মার্চ জনসাধারণের অসুবিধা দূর করার জন্য এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধ করার জন্য কতিপয় ব্যাখ্যা ও ছাড় দিয়ে নির্দেশনামা জারি করে জনগণের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন।" এসব নির্দেশের মধ্যে ছিল ব্যাংকের কার্যকাল মেয়াদ, সড়ক ও নৌ পরিবহন, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য, ধান ও পাটের বীজ বিতরণ, জনস্বাস্থ্যমূলক এবং বাঙালিদের জন্য ট্রেজারি অফিসে কাজকর্ম চালু রাখার কথা। ডাক ও তার বিভাগকে কেবল পূর্ব বাংলার মধ্যে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম

আদান-প্রদানের কাজ চালু রাখার জন্য আদেশ দেয়া হয়। শুধু বৈদেশিক তারবার্তা সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যতিক্রম রাখা হয়। এক্ষেত্রে তার বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের সামান্যতম সমালোচনার সংবাদও সেন্সর করে পাঠাতেন। তাজউদ্দিন সাহেবের ব্যাখ্যা ও অব্যাহতি বা ছাড় বাইবেলের উক্তির ন্যায় মেনে চলা হলো।

এ সমস্ত কর্মসূচির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পূর্ব বাংলায় একটি সমান্তরাল আওয়ামী লীগ সরকার চালু হয়ে গেল। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই ঘটনা নজিরবিহীন।

পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের শক্তির অমিত তেজে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য করাচিগামী জাহাজের চলাচলও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জটিলতা বেড়ে গেল। সুতরাং ঢাকা এয়ারপোর্ট একটা পাগলা গারদ হয়ে উঠল। সেখানে সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল।

তাদের সাহায্য করতে সেনাবাহিনী এগিয়ে এলো। কেননা, এখন তারা আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের সকল আন্তর্জাতিক সার্ভিস বাতিল করে সকল ফ্লাইট ঢাকায় সরকারি যাত্রী বহন করার কাজে ব্যবহৃত হলো। এ সমস্ত যাত্রী ছিল পূর্ব বাংলার জন্য বেসামরিক পোশাকে, সামরিক বাহিনীর সদস্য। বিমানগুলো সার্বক্ষণিকভাবে যাতায়াত করছিল। ফেরার পথে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে যে প্রচণ্ডভীতি দেখা দেয়, তা ভিত্তিহীন ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিষ্কার নির্দেশাবলী এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবাঙালিদের জড়িয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা এবং আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র শহরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহ জানেন, কারা গুজব রটিয়েছিল যে, অবাঙালিদের শীঘ্রই জবাই করা হবে যা শুনে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এহেন ঘৃণা ও আতঙ্কজনিত পরিস্থিতিতে প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনাই অতিরঞ্জিত হয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কিছু সংখ্যক অবাঙালির আসন্ন ভীতির যথার্থ কারণ ছিল। শোষকশ্রেণির অংশ হিসেবে তারা নির্দয়ভাবে বাঙালিদের সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণ করেছে এবং তাদের রক্তপাত ঘটিয়েছে। উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় এবং পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে সমস্ত বিহারী ভারত থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে পূর্ব বাংলায় আসে, তখন তাদের যারা আশ্রয় দিয়েছিল সেই বাঙালিদের কাছ থেকে তারা নিজেদেরকে সাধারণত পৃথক করে দেখেছিল। তারা বাংলায় কথা বলতে অস্বীকার করতো। কথাবার্তায় তারা কেবল উর্দু বা ইংরেজি ব্যবহার করতো। কিছু কিছু অবাঙালির মনোভাব ছিল ভীষণ উস্কানিমূলক। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু গত শীত ঋতুর মাসগুলো পূর্ব বাংলায় কাটিয়ে এসে সেখানকার একটি ঘটনায় তাঁর অপমানিত হওয়ার কথা আমাকে বলেছেন। সেখানে তিনি তাঁর বাড়িওয়ালাকে যিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর দরিদ্র বাঙালি চাকরদেরকে না খেতে দিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য ডাস্টবিনে ফেলে দিতে দেখেছেন। এ ধরনের

লোকদের যেকোনো সমাজে তাদের কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ ভয় পাওয়ার কারণ থাকে। কিন্তু তাই বলে ২৫ মার্চের রাতে সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর অবাঙালি পরিবারদের ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে, তাকেও ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না।

১৫ মার্চ আইন অমান্য আন্দোলনকে আরো কঠোর করা হলো। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, সরকারি কর্মচারিগণ কর্তৃক আওয়ামী লীগের নামে কেবল করই সংগৃহীত হলো না, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সমগ্র শাসনযন্ত্রই আওয়ামী লীগের নির্দেশে চলতে লাগলো।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুষ্ঠু আত্মপ্রসাদ লাভের কথা বুঝতে পারলো না। ইয়াহিয়া খান ব্যর্থ হয়েছেন এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মতো তিনিও অন্য কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবেন–এমন কথা যথেষ্ট শোনা গেল। এই গুঞ্জন তখন কে দায়িত্ব নেবেন সে সম্পর্কে জল্পনা কল্পনার খেলায় পরিণত হলো। সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করছিল। কেবল উর্ধ্বতন অফিসারগণই জানতেন যে, কী হতে যাচ্ছে? কিন্তু নগণ্য সংখ্যক অন্য কর্মচারী, যারা সামরিক বাহিনীর গতিবিধির অজস্র প্রমাণ পরীক্ষা করে এই খেলা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের সন্দেহের কথা কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো চরম দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননার শিকারে পরিণত হলো। স্থানীয় বাজার থেকে সেনাদলকে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে অস্বীকার করা হলো। তারা বাজারে জিনিসপত্র কিনতে গেলে তাদের ব্যঙ্গ করা হত ও তাদের ওপর থুথু ফেলা হত। কোন দোকানদারই তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করতো না। শীঘ্রই তাদের খাদ্যের মান অতি সস্তার ডাল-রুটির পর্যায়ে নেমে এলো এবং কোনো কোনো সময় তাও আসতো করাচী থেকে—মাংস, শাক-সব্জি সরবরাহের সঙ্গে বিমান বাহিনীর মালবাহী বিমানে করে।

ঐসব কষ্টের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কুমিল্লাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীতে কর্মরত জনৈক পাঠান আমাকে বলেছেন যে, তাদের একটি দলকে কীভাবে একদল বিক্ষোভকারী ছাত্র রাস্তায় পাকড়াও করেছিল। আমাদের প্যান্ট খুলে উলঙ্গ করে তারা আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। সে আরো বলল, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেকের পরনেই জাঙ্গিয়া ছিল। নতুবা আমাদের লজ্জাকর অবস্থা হত আরো ভয়াবহ।

ঐ পাঠান ও তার বন্ধুরা হয়তো ২৫ মার্চের পরে তাদের তরুণ উৎপীড়কদের ওপর মারাত্মক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তারা যা করেছে সে সব কথা স্মরণ করলে এখনো আমার মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার কথা বলতে গেলে বহু কথা বলা যায়। পঁচিশ দিনের দুঃস্বপ্নের কালে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ তাদের সেনাদেরকে সংযত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কীভাবে তাঁরা তা করেছেন, একথা কুমিল্লার একজন

অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ আহ্ আমরা তাদেরকে ধৈর্য ধারণের জন্য এবং অবস্থার উন্নতির প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য সবসময় বলতাম। এমন কি আমি নিজেও জানতাম না কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু আমাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের শান্তভাবে অপেক্ষা করার পেছনে যথার্থ কারণ রয়েছে এবং আমরা তাই করেছিলাম। তখন ঐ জারজ সন্তানেরা আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিল তার জন্য দুঃখ করছে।

সম্ভবতঃ বাঙালিদের হাতে চরমভাবে অপমানিত হন লেঃ জেনারেল টিক্কা খান নিজেই। এই সেনাধ্যক্ষ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বৈত ভূমিকা পালনের জন্য ঢাকায় আসেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আকস্মিকভাবে বরখাস্ত হয়ে গভর্নর আহসান বিদায় নেন এবং টিক্কা খান গভর্নর হাউজে এসে উঠেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাকে শপথ গ্রহণ করানো হয়নি। মনে হয় সামরিক টুপি পরিহিত সেনাধ্যক্ষ প্রশাসনিক আদব কায়দার যথার্থতা সম্পর্কে উদ্বেগ সহকারে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। শেষে ৯ মার্চ টিক্কা খান গভর্নর হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলার প্রধান বিচারপতিকে তলব করেন। বিচারপতি সিদ্দিকী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঢাকা হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিও তাঁকে অনুসরণ করেন। শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী সর্বোচ্চস্তরে পালিত হচ্ছিল এতে টিক্কা খান ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর করার কিছু ছিল না। যাই হোক, ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে গেল। যে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল, তা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক তাঁর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের ছোট দোতলা বাড়ি থেকে পরিচালিত হত। সেখানে অবশ্য সামরিক এলাকাও ছিল। তা সামরিক শাসনের প্রধান অফিসে পরিণত হয় এবং টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত হয়। ইতোমধ্যেই সেখানে এসে আসন গেড়ে বসেছিলেন কাজেই টিক্কা খানকে কেবল একটি সামরিক টুপি নিয়েই ২৭ মার্চ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে হলো। যখন সেনাবাহিনী নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয় এবং তিনি প্রধান বিচারপতির চাকরির ওপর আধিপত্য করার মতো মর্যাদা লাভ করেন।

১৫ মার্চ যখন আইন অমান্য আন্দোলন চরম মাত্রায় পৌঁছে তখন ইয়াহিয়া খান ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁর ঢাকা আসার যে কারণ দেখানো হয়, তা হলো একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, সংকটময়কালে তিনি আরো অধিক সময় নষ্ট করতে চান। সে সময় এমন কি শেখ মুজিবের পক্ষেও স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াহিয়া খানের জন্য এটা ছিল আলোচনাকালে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা শুরু করার সময়।

একটা মীমাংসা সম্পর্কে শাসকচক্রের যদি আন্তরিকতা থাকতো তা হলে এ সন্ধিকালে এসব তারা করতো না। ১৪ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের ঢাকা আসার আগের দিন টিক্কা খান এক সামরিক আইন

আদেশ জারি করলেন যে, যেসব সরকারি কর্মচারী প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে বেতন পাচ্ছেন তাঁদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। আদেশে আরো বলা হয় কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে তাঁদেরকে শুধু বরখাস্তই করা হবে না বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের বিচার করা হবে। এই চরম আদেশের মেয়াদের অবসানও প্রেসিডেন্টের আগমন যুগপৎ ঘটেছে। ঘটনাটিকে কেউই গ্রাহ্য করেনি। দু'দিন পরে একই আদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবার তাঁদেরকে তিন দিনের নোটিশ দেয়া হল। এতে বলা হল দুস্কৃতিকারীদের হুমকিতে কাজে যোগদানে বিরত থাকতে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন তাঁরা তিনদিনের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন। মীমাংসা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর যদি আন্তরিকতা থাকতো তাহলে স্পষ্টতই এহেন উস্কানি এড়িয়ে চলতেন। শেখ মুজিব এবং বাঙালিরা এ ব্যাপারে সাড়া দিতে পারতেন এবং তা তাঁরা দিয়েছেনও। তাঁরা এই আদেশ অগ্রাহ্য করেছেন। ১৬ মার্চে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ মুজিবের বৈঠকের প্রথমেই এটাকে পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে পরিণত করা হলো।

প্রেসিডেন্টের দল এবং সরকারি আলোচনাকারী দল-এর মধ্যে আরো উস্কানি দেওয়া হচ্ছিল, তা ছিল আলোচনায় জট পাকানোর উদ্দেশে। পূর্বোক্ত দলে ছিলেন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক রিজভী। এই লোকটি ১৯৬৮ সালে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরির জন্য দায়ী ছিল। এই দলে ছিলেন আরেকটি মামদো ভূত। যাঁকে বাঙালিরা সবচেয়ে ঘৃণিত এবং অবাঞ্ছিত বলে জানে, তিনি হলেন আন্তঃগোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল আকবর। এই দলের শোভাবর্ধক লেঃ কর্নেল হাসান, যিনি ছিলেন ঐ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের অন্যতম উকিল। তাঁকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য, যাতে এসব ব্যক্তি শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে। তাছাড়া এই লোকটি সামরিক আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক আইনবিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু জানার জন্য তাঁর প্রয়োজন। এই অজুহাতে তাঁকে দলভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট এই দলের চেয়ে অধিক উস্কানিদানকারী দল কোনো রাষ্ট্রপ্রধান তার সঙ্গে নেয়ার জন্য মনোনীত করতে পারতেন না। আওয়ামী লীগ প্রধানের এ বৈঠক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীসূচক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠকের সময় তিনি প্রেসিডেন্ট কক্ষের প্রবেশ পথে এই লোকগুলোকে চলাফেরা করতে দেখলেন। নিজের বাসভবনে ফিরে এসে শেখ মুজিব তাঁর এক বন্ধুকে বললেন– ইয়াহিয়া তাঁর জালিমগুলোকেও সঙ্গে করে এনেছেন। তিনি কী চান যে আমি এদের সঙ্গে কথা বলি।

তথাপি শেখ মুজিব অচলাবস্থা উত্তরণে শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মর্যাদা হারাননি। সরকারি দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি তাজউদ্দিন, ড. রেহমান সোবহান ও ড. কামাল হোসেনকে পাঠান এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখেন।

আলোচনা সভাগুলো ছিল প্রহসন এবং স্মরণ করার মতো কিছুই ছিল না। সেগুলো সফল হবে বলে কখনো আশাও করা যায়নি। আলোচনাগুলো ছিল ঠিক রণকৌশলের মতো, যা টিক্কা খানও সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সেনা ও রণসম্ভার আনার জন্য আরো কিছু সময় দিয়েছে। সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আলোচনা কখনো ভেঙ্গে যায়নি। তার সমাপ্তি ঘটেছে ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর "অপারেশন সার্চ লাইট" ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত আলোচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমন কি প্রেসিডেন্ট যখন আকাশ পথে করাচি ফিরে যাচ্ছিলেন তখনো তিনি মীমাংসার আস্থা পোষণ করছিলেন। "পূর্ব পাকিস্তানে সংকট" শীর্ষক সরকারি শ্বেতপত্র আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে নীরব থাকার সুযোগ নিয়েছে। সরকারি দলের চাতুরীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শেখ মুজিবের সর্বশেষ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাতে তিনি বলেছেন— ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতৈক্যে পৌঁছেছি এবং আমি আশা করি প্রেসিডেন্ট এখন তা ঘোষণা করবেন। বিদেশি সাংবাদিকগণ যখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই অকপট উক্তি হজম করছিলেন। তখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা যেকোনো মুহূর্তের নোটিশে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিঃশব্দে তাদের ট্যাংক সাঁজোয়া গাড়িতে ও ট্র্যাকগুলোতে অপেক্ষা করছিল।

এসব থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে ইয়াহিয়া খান ও তার অফিসারদের হাতে এভাবে প্রতারিত হওয়ার মতো অবিশ্বাস্যরূপে নির্বোধ না হলেও বিস্ময়কররূপে সরল ছিলেন। এই ধারণা আমি নিঃসন্দেহে পোষণ করতে পারি না। প্রমাণাদি একথার ওপর স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দেয় যে, ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ঢাকাস্থ গভর্নমেন্ট ভবনটি ছিল সম্ভবতঃ আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক হেঁয়ালির নাট্যমঞ্চ। বাস্তবতার প্রতি আওয়ামী লীগের কৌতূহলজনক অজ্ঞতা, আমরা যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসন্ন বিপদ দেখতে পাচ্ছিলাম, তাদের কাছে ছিল আরো অধিক বিরক্তিকর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আমরা প্রতি মুহূর্তে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর জানতে পারিনি। ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতির প্রমাণ আওয়ামী লীগ আগে থেকে শুনেছিল।

পিআইএ বোয়িং এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানগুলো নিয়মিতভাবে সাজসরঞ্জামসহ যোদ্ধাদের বয়ে আনছিল। ঢাকা বিমানবন্দরটি মেশিনগান ও বিমান বিধ্বংসী কামানে সজ্জিত হয়ে বিমানঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। দূরবর্তী সীমান্ত জেলাগুলো থেকে ট্যাংকগুলো শহরে নিয়ে আসা হলো। সেগুলোকে শহরে ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া হলো। সেনাদলের নিয়মিত গতিবিধি চলতেই থাকলো। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী ও বাঙালি রেজিমেন্টে অফিসার ও লোকদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা হলো। কিছু লোককে করা হলো নিরস্ত্র। নেতৃবৃন্দ এ সমস্ত খবর জানতেন। ১৯ মার্চ ঢাকা শহর থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত

জয়দেবপুরে চীন নির্মিত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে পাহারারত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর একটি দলকে নিরস্ত্র করতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদল ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। সরকারি হিসাব মতে দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। আওয়ামী লীগের নিজস্ব হিসাব মতে সেনাবাহিনীর লোকদের গোলাগুলির ফলে নিহতের সংখ্যা ১২০ জন।

২৪ ফেব্রুয়ারির আগেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নের কাজ নস্যাৎ করার জন্য একটি কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে 'এবং চক্রান্তকারী শক্তিগুলো পুনরায় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হয়ে যাবার পর এবং বাঙালিদের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ৩ মার্চ শেখ মুজিব বলেন, 'দুঃখের কথা এই যে সমস্ত বিমানের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার কথা ছিল, তার বদলে সেগুলো সামরিক বাহিনীর লোক ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে—।'

এ সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে প্রেসিডেন্ট ও তার অফিসারদের সাথে বিরামহীনভাবে আলোচনায় নিযুক্ত রেখেছেন। এতে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সহজ বিজ্ঞতাও ছিল না। ৭ মার্চ রেসকোর্স জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান "পূর্ব বাংলার প্রতিটি ঘরকে দুর্গে পরিণত করার" নির্দেশ দেন, প্রদেশব্যাপী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। এই সহজাত প্রবৃত্তি ছিল যথার্থ, কিন্তু এ ব্যাপারে যে সমস্ত আদেশ দেয়া হয়েছিল, তা যথার্থভাবে কাজে পরিণত হয়নি। বস্তুতঃ ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের তিন রঙা পতাকা উত্তোলনের ঘটনা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। চারপাশে দুর্গ পরিখা খনন করার মতো যে প্রজ্ঞা জনগণের ছিল আরো অধিক প্রত্যয় প্রদান করবে এবং পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সামরিক ক্যান্টনমেন্টে যে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে তার সমকক্ষ নাহলেও তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বিলম্বে হলেও এই ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

যতই এটা দেখানো হোক, আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনে সাফল্য ততটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীপূর্ণ ছিল না। সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ এবং সবচেয়ে কম প্রস্তুতির ভ্রান্তি হয় ক্ষতিকর। ফলতঃ পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর মুষ্টিমেয় অফিসার ও জোয়ানদের বিস্ময়কর সাহস ও সংকল্পের দৃঢ়তা পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকদের অভিযানকে প্রতিরোধ করেছে। সেই দিনে তাঁরাই বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন। প্রতিটি দেশের সাহসী মানুষ তাঁদের সালাম জানাবে।

গণহত্যা

আমরা তাদেরকে খুঁজে খুঁজে খতম করছি।
–মেজর বশির, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। রাত আটটা ধানমন্ডিস্থ ৩২নং সড়কের প্রবেশমুখে একটি গলিতে একটি পরিচিত রিকশা দ্রুতগতিতে এসে থামলো। যে ভবনের বাইরে এসে থেমেছে সে ভবনটি হলো শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন। রিকশা চালক কাশছিল এবং হাঁপাচ্ছিল। সে বললো, 'বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি জরুরি চিরকুট নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে রিকশা চালিয়ে এসেছি। বাংলায় লেখা স্বাক্ষরবিহীন চিরকুট বার্তাটি ছিল সংক্ষিপ্ত ঃ

"আপনার বাসভবন আজ রাতে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।"

সে সময়ে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের একজন আমাকে বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আসন্ন হামলার খবর ঐ চিরকুটে তাঁরা প্রথমবারের মতো পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অঘোষিত প্রস্থান আওয়ামী লীগ মহলে বেশ নাড়া দিয়েছিল। তারপরেই যখন সেনাবাহিনীর অশুভ গতিবিধির লক্ষণ দেখা দিল তখন শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের সতর্ক করে দিলেন এবং গা ঢাকা দেয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন। বঙ্গবন্ধু নিজে কোনো সতর্কতা অবলম্বন করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমার জায়গায়' অর্থাৎ নিজ বাড়িতেই থাকবো। তখন থেকেই ক'জন বাঙালি তার খবর রেখেছেন। শেখ মুজিবের বেশ ক'জন অনুসারী আধঘণ্টা পরপর তাঁর বাসায় টেলিফোন করে তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন।' তাঁর গৃহভৃত্য 'হু' 'হ্যাঁ' ধরনের জবাব দিচ্ছিল। রাত দেড়টায়, আড়াই ঘণ্টা পরে, গোলাগুলির আওয়াজে আকাশ বাতাস উত্তাল। আগুনের চোখ-ধাঁধানো শিখায় রাতের আকাশ যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে সময় শেখ মুজিবের বাসার টেলিফোনটি স্তব্ধ হয়ে গেল। ভীষণ আতঙ্কের ভেতরে একথা প্রচারিত হলো যে, সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেছে।

একজন প্রতিবেশী তিন সপ্তাহ পরে বাড়ির দেয়ালে বুলেটের গর্তের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে কীভাবে শেখ মুজিব শান্ত অবস্থায় গ্রেফতারকারীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেদিনের সে ঘটনা স্মরণ করে আমাকে সব বললেন।

তিনি বললেন, রাত দেড়টায় সেনাবাহিনীর দু'টি জীপ ও কয়েকটি ট্রাক ৩২নং সড়কের সদর দরজায় এসে থামলো। কয়েক মুহূর্ত পর পাকসেনারা পঙ্গপালের মত বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বাগানে সমবেত হলো। বাড়ির ছাদ ও ওপর তলার জানালা লক্ষ্য করে

কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো। সেনাবাহিনীর লোকেরা সরাসরি আক্রমণ করেনি শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। তখন এই গোলমালের মধ্যে শেখ মুজিব তাঁর ওপর তলার শোবার ঘরে ছিলেন। সেখান থেকে শোনা গেল, 'তোমরা অমন বর্বরের মতো আচরণ করছো কেন? আমাকে তোমরা ডাকলেই তো আমি তোমাদের কাছে নেমে আসতাম।' পাজামার ওপর তামাটে লাল রঙের গাউন পরিহিত শেখ মুজিব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন, সেখানে একজন তরুণ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সংবাদদাতা আমাকে বলেছেন যে, এই অফিসারটি ছিল বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। সে দৃঢ় ও বিনয়ী কণ্ঠে বললো, আমার সঙ্গে চলে আসুন স্যার। তারপর শেখ মুজিবকে নিয়ে তারা সবাই গাড়িতে উঠে চলে গেল।

বেগম মুজিব ও তাঁদের শিশু পুত্র পাশের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে সেনাভর্তি আরেকটি ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল। এবার পাক সেনারা মোটেই ভদ্র ব্যবহার করল না। তারা নিচের তলার প্রতিটি জনালার কাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করল। আসবাবপত্র, বিছানাপত্র ও পুস্তক রাখার আলমারিগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তছনছ করে দিল। দেওয়াল থেকে আলোকচিত্র ও তৈলচিত্রগুলো বিচ্ছিন্ন করে ভেঙ্গেচুরে মেঝের উপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ফেললো। হালকা রূপালী ফ্রেমে আঁটা চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরকৃত একটি ছবি তার মধ্যে ছিল। আমি ভেবে বিস্মিত হলাম শেখ মুজিব এ ছবি কি করে পেলেন। পাকসেনারা ঠিক কোনো কিছুর খোঁজ করছিল না। তারা যেন শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করছিল যেমন আহত বাঘ বৃষকে আক্রমণ করে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন শেখ মুজিবের বাড়িতে যাই, তখন এসব কিছুরই প্রমাণ দেখতে পাই। সেখানে প্রাণি বলতে ছিল একটা ধূসর রঙের বড় বিড়াল। বিড়ালটি সেখানে এসে আমাদের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। আর ছিল আবর্জনায় ঠোকররত তিনটি মুরগি ও ঘরের পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ডজন খানেক কবুতর। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। ঠিক এরূপ বাড়ি আমি পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকায় দেখেছি—সমগ্র গ্রাম ও শহরের সারিসারি বাড়ি শূন্য রেখে জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। বাড়িঘর ত্যাগ করার আগে তারা ক্রুদ্ধ সমর দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য সবুজ ও সাদা রঙের হাজার হাজার পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে রেখে গেছে। বর্বরতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা স্বরূপ এই পতাকাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকদের খুব কমই কাজে লেগেছে। তা সত্ত্বেও সেগুলো সোনালী সূর্য কিরণে দুলতে থাকে, জনবিহীন ভৌতিক অবকাশ উদযাপনের মতো।

যারা সৌভাগ্যবান তারা সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়। এদের প্রায় সকলেই নিয়তি নির্ধারিত ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অন্যেরা শেখ মুজিবের মতো ধরা পড়ে। জনগণের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়; এবং বেয়োনেটের খোঁচায় ও গুলির আঘাতে নিহত বিকৃত দেহগুলো স্ফীত অবস্থায় মাঠে, খানা-খন্দকে ও বাতাসে মৃদুভাবে আন্দোলিত নারকেল গাছপালার মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। হাঁটু উঁচু ধানের সবুজ কার্পেট, মধ্যে মধ্যে কাঁচ স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু কুটিরের সারি শোভা পাচ্ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে লাল বর্ণের চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল চিত্র দেখে মনে হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন পূর্ণতা লাভ করেছে। আম কাঁঠালের গাছগুলো ফলভারে নুয়ে পড়েছে। চাঁপা ফুলের মন মাতানো সৌরভে বাতাস পরিপূর্ণ। প্রকৃতির যৌবন যেখানে থরেবিথরে সাজানো, সেখানে হতভাগ্য কেবল মানুষগুলোই বিসদৃশভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মার্চের সেই ভয়ংকর রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরুপায় নিশ্চেষ্টতা ছিল বিস্ময়কর। এটা সহিংস সুতীব্র রক্তপাত বিরোধী কাজ, যা রাজধানীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল। যে মুহূর্তে পূর্বাঞ্চলীয় সেনানিবাসে প্রধান দপ্তরে খবর পৌঁছলো যে, প্রেসিডেন্ট নিরাপদে করাচীতে পৌঁছেছেন, সেই মুহূর্তে পাকসেনাবাহিনী কাজে লেগে পড়ল। এটা ঘটেছিল রাত সাড়ে এগারটায়। মাঝরাতের মধ্যেই পাকসেনাবাহিনীর সব দলই তাদের ভয়াবহ কাজে লেগে গেল। ট্যাঙ্ক, বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ পিলখানায় পূর্বপাকিস্তান রাইফেল বাহিনীকে আক্রমণ করলো। একই সময়ে রাজারবাগসহ পুলিশের প্রধান কার্যালয়ও আক্রান্ত হলো। উভয় স্থানেই অপ্রস্তুত বাঙালিরা যাদের সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বটে, তবে আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে তাদের প্রতিরোধ আরো জোরদার হতো। যাহোক এর পরিণাম ছিল সুস্পষ্ট। পাকসেনাবাহিনীর ছিল আকস্মিক আক্রমণের আয়োজন, আর ছিল অধিক সংখ্যক সেনাবল, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র ও গোলাবারুদের সুবিধা। বাঙালি বাহিনীর লোকেরা মৃত্যুবরণের আগে পাকসেনাবাহিনীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ছাড়ে। আমরা যখন আক্রান্ত এলাকা দেখতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের সাহায্যকারী লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করেছিল।

শহরের অন্যত্র পাকসেনাবাহিনীর দলগুলো বাজুকা, অগ্নি নিক্ষেপকারী অস্ত্র, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং সময় সময় ট্যাঙ্কসহ পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যস্থলগুলোতে আক্রমণ চালায়। তাদের একটি ইউনিট আওয়ামী লীগপন্থী পত্রিকা 'দি পিপল'-এর অফিসে যায়। অফিসটি ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের কাছেই। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে অবস্থানরত দলবদ্ধ ভীত বিদেশি সাংবাদিকদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে অবস্থিত। ঐ সেনাবাহিনীর লোকেরা সংকীর্ণ গলিতে সরাসরি গুলি ছোড়ে। পত্রিকা অফিসের কর্মচারিগণ পালাতে চেষ্টা করলে তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। দালানের যা অবশিষ্ট ছিল তাতে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই সেনাবাহিনী একটি শত্রু নিধনযজ্ঞ সমাপ্ত করে (রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ দৈনিক ইত্তেফাক, বংশাল রোডস্থ 'সংবাদ' পত্রিকাটিও আক্রান্ত হয়। পত্রিকার ক'জন সাংবাদিকসহ প্রতিষ্ঠানটির সবকিছু পুড়িয়ে দেয়া হয়)। শহরের অপর প্রান্তে একটি প্রসিদ্ধ বাংলা সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ভাগ্যেও একই দশা ঘটে। যখন প্রকাশ পেল যে কাজটি ভুলবশতঃ হয়ে গেছে তখন সেনাবাহিনী তা সংশোধন করলো।

পত্রিকা অফিস পুনর্নির্মিত হলো এবং কোনো এক স্থানের একটি পুরনো ছাপাখানা ধার করে পত্রিকাটি পুনরায় চালু করা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসগুলোতে নিহত শত শত ছাত্র ও শিক্ষক কিংবা শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার অথবা বিরাট রেসকোর্স ময়দানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মন্দিরের চারপাশে অবস্থিত সারিসারি ঘরগুলোতে বসবাসরত হাজার হাজার নিহত হিন্দুদের জন্য কেউ চোখের জল ফেললো না। পাকসেনাবাহিনীর লোকেরা শাঁখারি বাজারের অপ্রশস্ত বাঁকখাওয়া রাস্তার উভয় প্রান্ত অবরোধ করে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে প্রায় আট হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে।

টহলরত সেনাবাহিনীর আরেকটি দল নিউ মার্কেটের নিকটবর্তী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে হানা দেয়। তিনি ছিলেন একজন নামী আওয়ামী লীগ কর্মী ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। তিনি ১৯৬৮ সালের তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সহ অভিযুক্ত ছিলেন। এই হতভাগ্য কমান্ডারকে ঘর থেকে টেনে বের করা হয় এবং তার সন্ত্রস্ত স্ত্রীর সম্মুখে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। চলে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ পাকসেনারা ঘরের বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা এবং ছাত্রনেতাদের ওপর পাকসেনারা শিকারী কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সামরিক বাহিনীর আক্রোশের বিশেষ লক্ষ্য ছিল মুসলিম ছাত্রাবাস 'ইকবাল হল' এবং এর নিকটতবর্তী হিন্দু ছাত্রাবাস 'জগন্নাথ হল'। পাকসেনাবাহিনীর লোকেরা দু'টো হলই ঘেরাও করে এবং বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদির সাহায্যে কয়েক মিনিট অফুরন্ত গুলিবর্ষণের পর অবরুদ্ধ হলগুলোতে বসবাসরত ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করে। নিহত হিন্দু ছাত্রদের হলের আঙ্গিনার বাইরে তাড়াহুড়ো করে কাটা একটি পরিখায় মাটি চাপা দেয়া হয় কিংবা হল ভবনের ছাদের ওপর পচনের জন্য ফেলে রাখা হয়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল অংশ হিসেবে পরিচিত শত শত অধ্যাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষককে 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য ডেকে নিয়ে কীভাবে রাতারাতি চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দেশ থেকে পলায়নরত বাঙালিরা তার বর্ণনা দিয়েছে। নিরপেক্ষ নির্দলীয় লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি তা' সমর্থন করেছে। ঠিক একইভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত ভয়ংকর 'শুদ্ধি অভিযানের' মাধ্যমে বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে রক্তস্নান চলে। ২৬ মার্চের পূর্বাহ্নে প্রকাশ্য দিবালোকে কার্ফু বা সান্ধ্য আইন ভঙ্গের দায়ে কয়েকশ' নিরীহ নিরপরাধ লোককে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। অথচ কার্ফু বা সান্ধ্য আইনের কথা ঘোষণার মাধ্যমে জনসাধারণকে আগে জানানো হয়নি। আনুমানিক দশটার মধ্যে যখন এ কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো, তখন পূর্ব নির্ধারিত শিকারদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে আটক করার জন্য সান্ধ্য আইনকে ব্যবহার করা হলো।

প্রায় সেই একই সময়ে পাকসেনাবাহিনী অন্যদিকে তাদের পৈশাচিক দম্ভ দেখাতে লাগলো। ভুট্টো সাহেবসহ যে সকল রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ঢাকা এসেছিলেন, তাঁরাও জানতে পারেননি যে, ভুট্টো সাহেব ২৫ মার্চ সকালে চলে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের সঙ্গে তার সাক্ষাতকারের কথা ছিল। দৃশ্যতঃ ভুট্টো অধিক জরুরি কাজে আটকা পড়ে শেখ মুজিবের কাছে বিকেল ছ'টার দিকে এই মর্মে টেলিফোন করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে তাদের মধ্যেকার বৈঠক পরদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছেন। শেখ মুজিব এর জবাবে তাঁকে বললেন, 'বৈঠক স্থগিত রাখতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি কি করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করছেন? তিনি তো ইতোমধ্যেই করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।' কয়েকজন ছাত্র নেতার প্রদত্ত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ভুট্টো এতে বিস্মিত হন। তিনি প্রেসিডেন্টের ভবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন! কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট এখন 'পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসে ডিনার খাচ্ছেন। কাজেই এখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। মনে হয় ভুট্টো সংবাদটি পেয়েছিলেন। পরদিন তাঁকে প্রাসঙ্গিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। করাচির উদ্দেশে রওয়ানা দেবার জন্য বিমানে উঠার আগে তাঁর সামরিক প্রহরীগণ তাঁকে, সেনাবাহিনীর লোকেরা তখনো পর্যন্ত শহরের যে সমস্ত এলাকায় নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছিল সে সমস্ত এলাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে নিয়ে যায়। ভুট্টোর অনুসারীগণ বলেন যে, এর কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু অপর একজন রাজনীতিবিদ আমাকে বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর উদ্দেশের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে, এর পরিণতি কী হবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখানোর অভিপ্রায়েই এ ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভুট্টো যা দেখেছেন সে সম্পর্কে তিনি অন্ধ কিংবা অনুভূতিহীন থাকতে পারেননি। করাচি আগমনের পর 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে' বলে তিনি যে প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর নৃশংসতার সমর্থন করেছেন, তা' সম্ভবতঃ এই শতাব্দীর একজন জননেতার সবচেয়ে মারাত্মক উক্তি ও ভ্রান্তি। যা হোক, ক্রমে ক্রমে হত্যাযজ্ঞের দৃষ্টান্ত চোখে পড়তে লাগলো। ভীত সন্ত্রস্ত্র বাঙালিরা সহসা বুঝতে পারলো যে, পশ্চিম পাকিস্ত ানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করেছে।

সারা প্রদেশ জুড়ে হত্যাকাণ্ডের সুব্যবস্থার নমুনার সঙ্গে জেনোসাইড বা গণহত্যা শব্দটির আভিধানিক সংজ্ঞার হুবহু মিল রয়েছে। আমি যখন (এপ্রিল, ১৯৭১) কুমিল্লাস্থ ১৪ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় সফরে যাই, তখন জানতে পারি যে, বর্বরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে উক্ত অভিযানের জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকর করা হচ্ছে।

গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু ছিল এই—

১। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা সামরিক আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোক।

২। হিন্দু সম্প্রদায়ের "আমরা কেবল হিন্দু পুরুষদেরকে হত্যা করছি, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সৈনিক, নারী শিশুদেরকে হত্যা করার মতো কাপুরুষ আমরা নই। কুমিল্লায় আমি একথা শুনেছি।

৩। আওয়ামী লীগের লোক—নিম্নতম পদ থেকে নেতৃত্বস্থানীয় পদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোক, বিশেষ করে এই দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।

৪। ছাত্র—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণের দল ও কিছু সংখ্যক ছাত্রী। যাঁরা ছিলেন অধিকতর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন।

৫। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা 'সংগ্রামী' বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক সবসময় নিন্দিত হতেন।

ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন তাদের নৃশংসতা চালাতো তখন তারা এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা সঙ্গে নিয়ে যেত। ২৫ মার্চের আগে সেই অবমাননাকর দিনগুলোতে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা তৈরি করা হয়। তারপর সেনাবাহিনীর লোকেরা ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।

হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে মনে করতো 'ভারতের অনুচর' তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কলুষিত করে ফেলেছে। বাঙালি সামরিক পুলিশ বাহিনীর লোকদের অনুসন্ধান করার কারণ তারাই একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত দল, যারা সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ দিতে সমর্থ। অন্যদেকে গণহত্যার আওতাভুক্ত করার কারণ তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি স্বরূপ মনে করা হচ্ছিল।

আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, গণহত্যা ছিল 'শোধন প্রক্রিয়া' যাকে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বলে মনে করতো। সেই সঙ্গে এই বর্বরোচিত উপায়ে প্রদেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিচ্ছিন্নতার হুমকি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেজন্য যদি বিশ লাখ লোককে হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটিকে ত্রিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে হয়, তবুও। কুমিল্লাস্থ ১৬নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে অভদ্রভাবে আমাকে একথা বলা হয়।

এই ছিল পূর্ব বাংলার সমস্যা সম্পর্কে সামরিক শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত সমাধান হিটলারের পর থেকে এ পর্যন্ত এমন পৈশাচিক দৃষ্টান্ত আর এই বিশ্বে দেখা যায়নি।

কুমিল্লা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন অবস্থানকালে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ অভিযানের ফলে যে প্রচণ্ড ভীতি দেখা দেয় তা আমি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু ও যারা সামরিক বাহিনীর চোখে অপরাধী ছিল তাদের ধরে এনে হত্যা করা হতো। আমি দেখেছি একটি পুলের ক্ষতি করা হলে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কীভাবে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

আমি স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসকের হাতে বিস্ময়কর আকস্মিকতার সঙ্গে একটি পেন্সিলের খোঁচায় মৃত্যুদণ্ড দিতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরেকজন হতভাগ্যকে চিহ্নিত করতে দেখেছি। রাত্রে সেনাবাহিনীর মেসে তথাকথিত ইজ্জতশালী ব্যক্তিদের, যারা সবাই ছিল ভালো লোক। দিনের বেলায় যে হত্যাযজ্ঞ তারা চালিয়েছে সে সম্পর্কে রসিকতা করতে এবং কে কত বেশি সংখ্যক বাঙালি হত্যা করেছে সে সম্পর্কে নগ্ন প্রতিযোগিতার আলাপ করতে শুনেছি।

আমি ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সংখ্যা 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় এ সমস্ত খবর পাঠিয়েছি। তখন থেকেই গণহত্যার বিবরণ আরো অধিক বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

সারা বিশ্ব জানে যে, কেন বাংলাদেশের আশি লাখ (পরে এক কোটি) পুরুষ, নারী ও শিশু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়েছে? কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোক মরেছে? কেন আরো অসংখ্য লোক এখন দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কারণে সম্ভাব্য মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে?

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানে পূর্ব বাংলার হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালি পুরুষ, নারী ও শিশুর ওপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার কথাও সাধারণভাবে সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু একথা আমরা জানি যে, বাঙালিদের হত্যা, বলাৎকার এবং নারী ও শিশুদের বিকলাঙ্গকরণের মতো ভয়াবহ কাজগুলো বোধগম্য রূপেই বাংলাদেশের যারা সংবেদনশীল মানুষ, তাদের বিব্রত করেছে। বাঙালিরা জীবনে এমন সত্যকে স্থাপন করেছে, যাকে অবহেলা করা যায় না, এই সত্য হলো বাংলাদেশের মুক্তি। প্রতিটি হত্যার পোস্টমোর্টেম করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন মনে করি, যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লায়। আমাকে সার্কিট হাউসের সবচেয়ে ওপর তলার একটি অতিথি কামরায় থাকতে দেয়া হয়। সেখানে সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর ছিল। ১৯ এপ্রিলের ভোরে আমি এই মূল্যবান লোকটিকে কুমিল্লা জেলে আটক তিনজন হিন্দু ও একজন খ্রিস্টান 'চোর'কে আকস্মিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে দেখেছি। জানা যায় যে চোরটিকে এক হিন্দুর বাড়ি থেকে তার মালিককে দেয়ার জন্য একটি থলে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। বাড়ির মালিক শহরের অপর প্রান্তে লুকিয়ে ছিল। পেন্সিল দিয়ে চারবার দাগ কেটে সে রাতেই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে এই লোকগুলোকে নিয়ে আসার জন্য একজন বিহারী দারোগাকে আদেশ দেয়া হলো। আমরা তখন গ্লাস ভর্তি নারকেল দুধ খাচ্ছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি জানতে পারলাম 'ব্যবস্থা গ্রহণ' কাকে বলে।

বিকেল ছ'টায় সান্ধ্য আইন জারীর কিছুক্ষণ আগে একটি দড়ি দিয়ে শিথিলভাবে বেঁধে সেই খ্রিস্টান ও তার তিন সঙ্গীকে রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে সার্কিট হাউসের আঙ্গিনায় আনা হলো। কয়েক মিনিট পর আমি তীব্র আর্তনাদ ও হাড়মাংসের উপর লাঠির সাহায্যে ক্ষিপ্ত আঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর্তনাদ বন্ধ হলো।

যেন সুইচ টিপে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার যন্ত্রণাজড়িত কানে আমি শুনতে পেলাম সেই নীরবতা সহসা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ আওয়াজে পরিণত হলো। সেই আওয়াজ লাখ লাখ বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং তা এখনো আমার কানে আঘাত করছে।

অন্ধকার কামরায় আমি তখন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। আধঘণ্টা পরে আমি শুনতে পেলাম জোয়ানরা হৈ চৈ করে তাদের রাতের খাবার খাচ্ছে। ব্যালকনির ওপর তাকাতে আমার সাহস হলো না, কেননা সে রাতে মানুষকে দেখার কথা আমার মনেই হয়নি। তখন ম্লান আলোকে পলায়নরত শিয়ালেরা এলো, বড় বড় কুৎসিত বাঁদুড়কে শুক্রবার রাতের ভয়ংকর ছায়াছবির রক্ত শোষক পিশাচের মত দেখাচ্ছিল। তারা ধীরে ধীরে সার্কিট হাউসের পার্শ্বস্থ ঝিলের (ক্ষুদ্র কৃত্রিম হ্রদ) ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং ডানদিকে ঘুরে সন্নিকটস্থ আমগাছে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য ফিরে এলো। আমার মন জানতো যে রাতের এই ফলভুক প্রাণিগুলোকে রক্ত শোষক পিশাচের মতো দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা ছিল না। প্রকৃত রক্ত শোষক পিশাচ ও দানবের দল তখন সার্কিট হাউসের অপর পার্শ্বে ছিল। এরা পাকিস্তানের বর্বরতম সেনাবাহিনী। আমাকে পালাতে হলো।

পূর্ব বাংলায় পাকসেনাবাহিনীর বর্বরতা কোনো অজুহাতেই ক্ষমা পেতে পারে না। সরকারি মুখপাত্রগণ যাকে রাষ্ট্র ও নাগরিক রক্ষা করার জন্য বিদ্রোহী বাঙালিদেও বিরুদ্ধে 'ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ কর্মব্যবস্থা' বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে বা পাকবাহিনীর 'গণহত্যা' কে অবাঙালি হত্যার সাথে মিলিয়ে যুক্তির অবতারণা করছে তা ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণাদি এই ৪টি প্রমাণাদির ওপর প্রতিষ্ঠা করে :

১. অবাঙালি হত্যার আগেই পাকবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল

২. বাঙালি অফিসারদের আসন্ন বিদ্রোহ করা বিষয়টি ২৬ মার্চ রাতে পরিকল্পনা হয়নি; কাজেই মাত্র একরাত আগে ধর্মঘট আহ্বানের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। (উল্লেখ্য, প্রকৃত ঘটনা ছিল ২৬ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা–অনুবাদক)।

৩. যা ছিল পাকিস্তানের অপরিহার্যরূপে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং সামরিক শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট। সেই সমস্যাকে সামরিক শাসকগোষ্ঠী নাৎসি পদ্ধতিতে সামরিক সমাধান ছিল তাদের উচ্চাকাঙ্খা বাস্তবায়নের কর্মপন্থা।

৪. বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিলোপসাধন ছিল পাক-সামরিক শাসকগোষ্ঠী অপর উদ্দেশ্য।

এই হলো 'রেইপ অব বাংলাদেশ' বা বাঙালির রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনে পাক-সামরিক কুচক্রীগোষ্ঠীর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল জনিত সম্ভ্রমলঙ্গিতা'এর বাস্তব ছবি। সমগ্র বিশ্বজুড়ে যত অপপ্রচারই চালান হোক না কেন, তা এইসব যথার্থ তথ্যকে গোপন রাখতে পারবে না। বাংলাদেশ এই 'রেইপ' বা অবৈধভাবে অধিকার বঞ্চনা ও লাঞ্ছিতা থেকে উদ্ভূত।

একজন মুক্তিযোদ্ধা

পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যাবলী

পাক-হানাদার বাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত দালানকোঠা

রাজাকার, আলবদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য

১৯৭১-এর গণহত্যা

ইয়াহিয়ার ষাঁড়ের চোখ

৯ মাস যুদ্ধের সময় শাঁখারিবাজার এলাকার নিত্যদিনের দৃশ্য

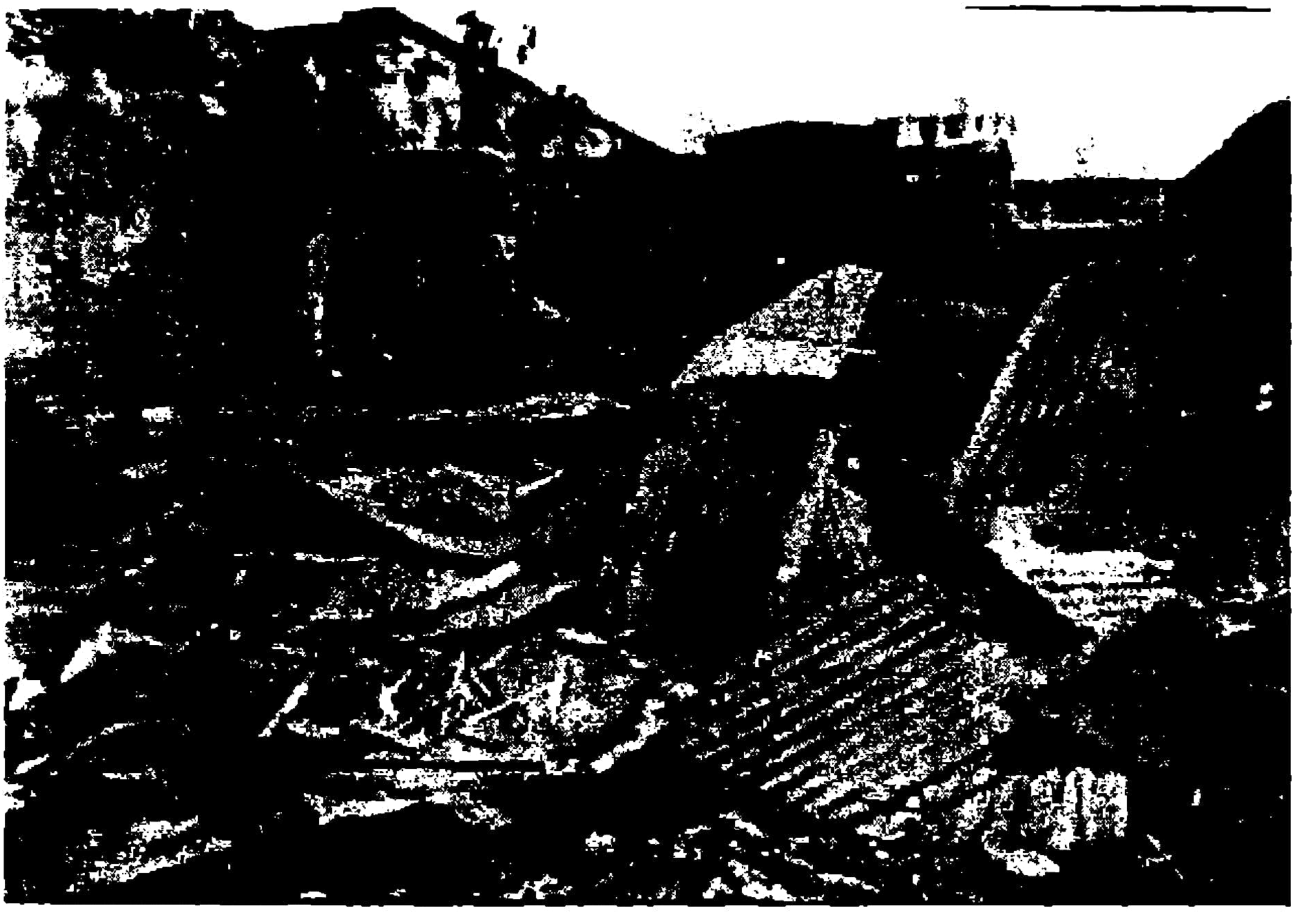

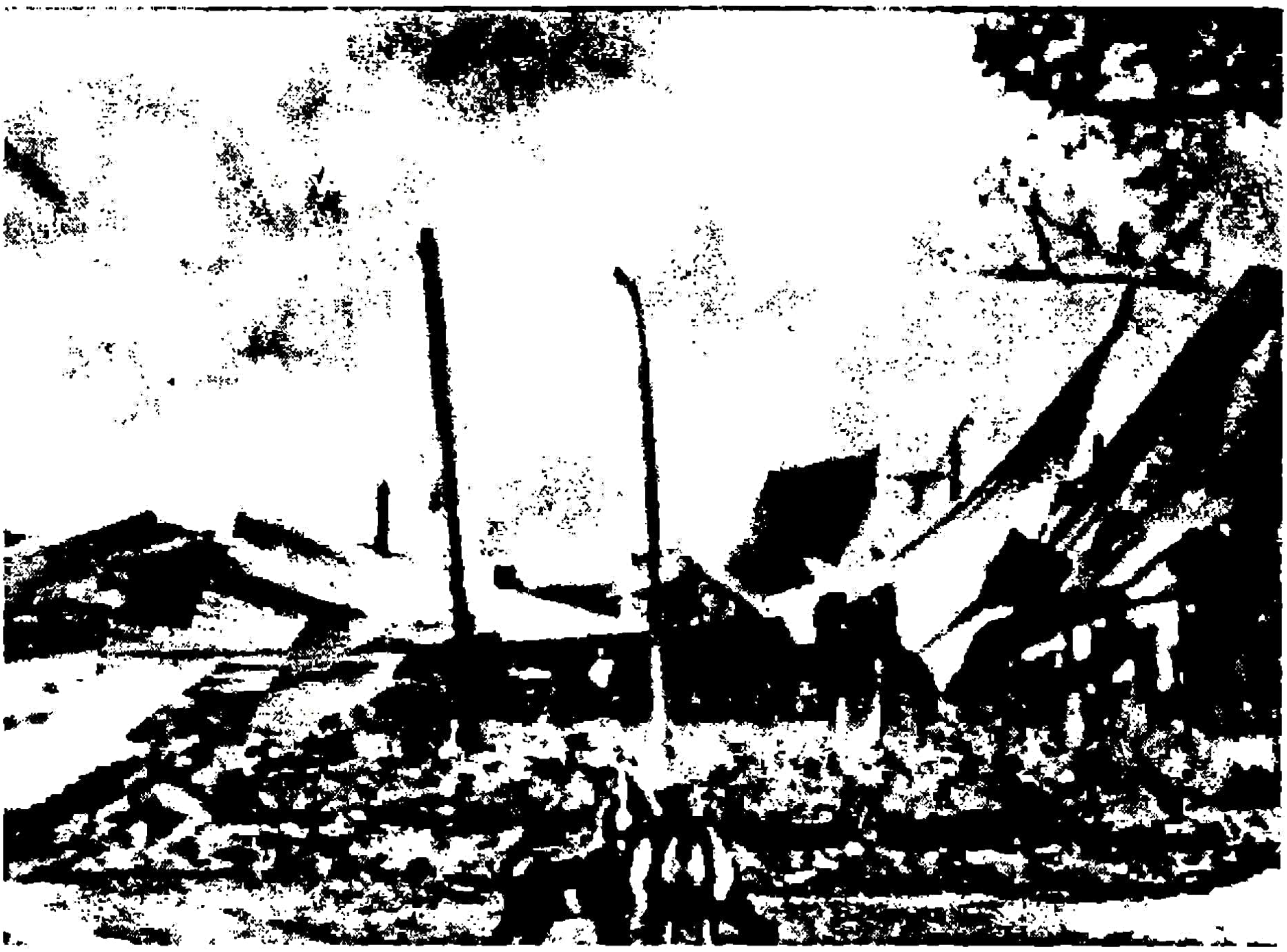

পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংস লীলা

গোয়েবলসের পুনরাগমন

'... পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হলেন গণহত্যার নীরব দর্শক... ।'

–প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদে
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

কোনো পাকিস্তানী কোনো বাঙালির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না, কিংবা কোনো বিদেশি তা' করতে গেলে তাকে অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এরূপ উক্তি করেছিলেন। কেউ কী এই অপরিহার্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অথবা আপনারা জানেন কী, এসব কী ঘটেছে? ১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। শুধু আমারই বলি কেন, এ ধরনের অভিজ্ঞতা পশ্চিম পাকিস্তানী আরো ক'জনেরও হয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশ ক'জন উঁচুদরের রাজনীতিবিদ রয়েছেন, যাঁরা ২৫ মার্চের রাতে পূর্ব বাংলায় সামরিক বর্বরতম অত্যাচার সংঘটনের পর বিদেশে গিয়েছেন তাদের সকলকেই ঐ নারকীয় ঘটনার জন্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

তাঁরা হয় নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকবেন। কিন্তু একে পুরোপুরি আপাত বিরোধী সত্য বলা চলে না। পাকিস্তানে এসব ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। এ বিষয়ে প্রচারণার জন্য যে উদ্ভাবনী ও কল্পনাপ্রবণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে—তার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ। এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে 'প্রোপাগান্ডা বিভাগ' বলা যেতে পারে।

এসব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক বলা যায়, তার কারণ, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কী ঘটেছে সে সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব এলাকার নারকীয় ঘটনার কোনো কিছুই জানতে পারেনি।

২৫ মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ সংবাদের ওপর কড়া সেন্সর জারি করেছিল। জুলাই মাসের শেষের দিকে যথারীতি সেন্সর তুলে নেওয়া হয়। এই সময়ে পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত বাংলা পত্রপত্রিকাগুলোসহ পাকিস্তানের কোনো সংবাদপত্রই পূর্ব বাংলায় সামরিক বর্বরতার কোনো খবর তো দূরের কথা, ঘটনার সঙ্গে সামান্য সত্যতা আছে এমন খবরও প্রকাশ করেনি। সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশও ছিল ঐরূপ। ঘটনার প্রথম দু'মাসের শেষের দিকে সংবাদপত্রে যেসব খবর প্রকাশিত হতো, তা খুব সতর্কতার সঙ্গে কাটছাঁট করে সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক তথ্য অফিসাররা সেসবের ইস্তেহার তৈরি করে দিতেন। পত্রিকাগুলো পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের

অসহযোগ আন্দোলনের পরে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার ওপর জোর দিয়েছিল। এবং প্রচার করতো যে, 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' এবং সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী অভিযান চালাচ্ছেন। শেষোক্ত সংবাদগুলো সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি লাইন পড়লেও দেশে কী ঘটছে তার প্রকৃত চিত্রের কোনো বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। সেসব সংবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নারকীয় সামরিক অভিযানে তখন পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার হত্যার লেশমাত্র উল্লেখ থাকতো না। কিংবা সংবাদ মাধ্যমে এই কথার উল্লেখ থাকতো না যে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ দুটি স্থানে কর্তৃত্ব বজায় রাখা ছাড়া প্রদেশের বাকি অংশ বাঙালিদের প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাকিস্তানিরা জানতো না যে, পাকিস্তান বিমান বাহিনী বাঙালি প্রতিরোধ সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে প্রত্যহ নিয়মিত বিমান হামলা চালাচ্ছে। কিংবা তারা একথাও জানতো না যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী আনসার ও মুজাহিদের মত পূর্ব বাংলার যাবতীয় সামরিক ইউনিটে বিদ্রোহ করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যারা শরণার্থী হয়ে গিয়েছে তারা তাদেরকে বাঙালিদের নৃশংসতার কাহিনী শুনিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা চালাচ্ছে তার কোনো সংবাদই তারা দেয়নি। এমন কি সংবাদপত্রেও তারা দেয়নি। এমন কি সংবাদপত্রের ভালো জানাশুনা সাংবাদিক ছাড়া প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কিছু বলাও হয়নি। আমাদেরকে উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা ও আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ কর্মকর্তা শুধু কিছু ব্যবস্থা কতিপয় বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে—এতটুকু বলা হয়েছে, এছাড়া বাস্তব ঘটনার কোনো সূত্রের আর কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

সুচতুরভাবে তৈরি ইস্তেহারগুলোতে জালিয়াতি করে সরকারি মালিকানাধীন রেডিও ও টেলিভিশনে ঐসব সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। টেলিভিশনে যেসব জনপ্রিয় প্রোগ্রাম থাকতো তার সঙ্গে দেখানো হতো দেশের কোথাও কিছু ঘটেনি। সংবাদ প্রচার করা হতো ও দেখানো হতো পূর্ব বাংলার শহরগুলোতে সবদিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য বিদেশি সংবাদ মাধ্যম বিশেষতঃ বিবিসি, আকাশবাণী এবং রেডিও অস্ট্রেলিয়া থেকে বিপরীত সংবাদই প্রচারিত হতো। উত্তেজনাকর এসব সংবাদ গভীর মনোযোগ দিয়েই বাঙালিরা শুনতো এবং আনন্দ পেত। পক্ষান্তরে পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমে বিদেশি বেতার কেন্দ্রগুলো যে সমস্ত সংবাদ প্রচার করতো সেসব ভারত কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার এবং অসত্য সংবাদ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হতো। সরকারি ইস্তেহারগুলোতে এসব সংবাদের ওপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল এবং এক সময় করাচি, লাহোর রাওয়ালপিন্ডির সংবাদপত্রগুলোতে প্রচারিত সংবাদের ব্যাখ্যা ছাপা হতো। কিন্তু কখনো ভুল সংবাদটি কী ছিল, তা ছাপা হতো না।

পাকিস্তানিরা গভীরভাবে দেশপ্রেমিক, তারা এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারে না যে তাদের সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে এত বেশি ভুল সংবাদ পরিবেশন করতে পারে।

সরকারের এসব কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে একটা জিনিস সবসময় দেশের মধ্যে বজায় ছিল তা হলো শক্তিশালী ভারতবিরোধী প্রবণতা। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে এই উপমহাদেশের 'হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে' স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য মুসলমানদের বিদ্রোহের কারণে। এই হিন্দু বিদ্বেষ মনোভাব বছরের পর বছর লালিত হয়ে এসেছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই ভারতবিরোধী প্রবণতা আরো বেড়েছে। আর একটি বিষয় হলো, সে সময় পূর্ব বাংলায় যা কিছু ঘটেছে সে সম্বন্ধে আকাশবাণীর সাহসী প্রতিবেদন সম্প্রচারে পাকিস্তানিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। এহেন পরিস্থিতিতে, ভারতবিরোধী সম্প্রচার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সহজ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে একটা আতঙ্কের ধারণা সৃষ্টি করা হলো যে, তারা আবার ভারতীয় আক্রমণের শিকার হতে যাচ্ছে।

সরকারের এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার হলো, যখন জানা গেল যে, ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব 'স্ট্র্যাটিজিক স্ট্যাডিজ বলেছে যে, ভারত আবার শতাব্দীর সুযোগ পেয়েছে যা থেকে উপমহাদেশের ভাগাভাগিকে বানচাল করতে পারবে।

এই মর্মে একটি সংবাদ পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় প্রধান শিরোনাম হলো এবং রেডিও পাকিস্তানে বারবার সম্প্রচারিত হতে লাগলো। এই স্বাভাবিক ধারণার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে ভারতের অনুপ্রেরণা রয়েছে। তাছাড়া ভারত অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাকিস্তান আক্রমণের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এভাবে ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক এর পরিচালকের ছেলেমানুষী মূলক উক্তি ভারতের কোনো উদ্দেশ্যকেই সফল করেনি বরং পাকিস্তানি সরকারি প্রোপাগান্ডাকারীদের জন্য স্বর্গ থেকে প্রেরিত সুযোগ হিসেবে কাজে লেগেছে।

সরকারি নির্দেশে এই সব খবর বিভিন্নভাবে কয়েকদিন ধরে রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোতে প্রচার ও প্রকাশিত হতে থাকে। সে সঙ্গে পত্রপত্রিকায় নেতৃবৃন্দের গভীর চিন্তা প্রসূত এ প্রতিক্রিয়া ছাপা হয় এবং ঘৃণামিশ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রচার পেতে থাকে। এ সংবাদ দু'সপ্তাহ ধরে প্রচার লাভ করে। এই দু'সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রায় সকলের মনেই এই বিশ্বাস বেশ দানা বেঁধেছে যে, 'ভারত ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং একটি বিশেষ পত্রিকাসমূহ সকল পত্রিকাগুলোতে এই মর্মে উপদেশ দেয়া হলো, দেশের এই নতুন জটিল সমস্যাসংকুল সময়ে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক-এর কর্তব্য সরকারকে সাহায্য করা।'

একথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা দুনিয়ার বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কড়া সেন্সরশীপের জন্য পরীক্ষা না করে বিরুদ্ধ

সংবাদ বহনকারী কোনো বিদেশি সংবাদপত্র ও সাময়িকী দেশের ভেতরে আসতে দেয়া হতো না। এ ধরনের পত্রপত্রিকায় যদি পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীর সামান্য উল্লেখও থাকতো, তাহলে তার প্রচার বন্ধ করে দেয়া হতো। ঐসব পত্রপত্রিকা পুড়িয়ে ফেলা হতো। এ ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন সুশৃঙ্খল ছিল যে, যে সমস্ত যাত্রী, তারা পাকিস্তানিই হোক কিংবা বিদেশি হোক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতেন। এসব যাত্রীদের সাথে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় পূর্ব বাংলার ঘটনার সামান্যতম উল্লেখ কোনো সংবাদপত্রে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করা হতো।

পাকিস্তানের জনসাধারণের চোখ ও কান বিদেশি প্রভাবের বাইরে রাখতে সক্ষম হলে সরকার একটি উদ্ভাবনক্ষম প্রচারণা অভিযান শুরু করে। পূর্ব বাংলার প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে এবং ভারতের 'আসন্ন হুমকি'কে সবচেয়ে বড় করে চতুর্গুণ পর্যায়ে প্রচারণা প্রতিদিন চালানো হলো। গোয়েবলসও এ কাজ এতটা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতো না।

এপ্রিলের মাঝামাঝি কয়েকজন সহকর্মী সাংবাদিকসহ আমি যখন পূর্ব বাংলায় যাই তখন আমাদের নির্দেশ দেয়া হলো যে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপকে বড় করে দেখাতে হবে এবং সব জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এটা প্রচারে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের আরো বলা হলো যে, 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী'দের কীর্তিকলাপ আমাদের দেখানো হবে। সে সময়ের সেনাবাহিনীর লোকেরা সবকিছু ছিমছাম করে ফেলেছে। কিন্তু বিধ্বস্ত রাস্তাঘাটগুলো ভরাট করতে কিংবা গোলাগুলির ধ্বংসের চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে পারেনি। তবে আমরা যেসব বাঙালি বন্ধুদের সাথে পরিচিত তাদের মুখ আটকে রাখতে পারেনি। সে কারণে ঢাকা সফর আমাদের জন্য সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার উপলব্ধিতে চোখ খুলে দিল। আমার এক সহকর্মী আমাদের দু'দিন আগে ঢাকায় এসেছিল—সে ফিসফিস করে আমাকে বলেছে, তারা 'হিন্দুদেরকে গণহত্যা' করেছে আর বাঙালি 'বুদ্ধিজীবী'দেরকে নির্মূল করেছে। তথাপি এই সাংবাদিক যিনি একটা সংবাদ সংস্থার নামী সংবাদদাতা হয়েও করাচীতে ঘটনার উল্টো প্রতিবেদনই পাঠাতেন। রেডিও সংবাদদাতা এবং টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ঐ একই কাজ করতেন।

এই ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে এক তরুণ দেশপ্রেমিক যে আমার সাথে কুমিল্লা সফরসঙ্গী হয়েছিল সে প্রচারণায় অনেক নিপুণ ছিল। সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারতো। সে সেনাবাহিনীর প্রোপাগাণ্ডাকেও হার মানিয়েছিল। তার কাজই ছিল দেশের সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এই প্রমাণ করা। তার সাথে কুমিল্লার অদূরে এক ছোট শহর লাকসাম সফরে যাই। মাত্র একদিন আগে সেনাবাহিনী শহরটিকে মুক্ত করেছে অথচ আমার কাছে পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলোর মতো এটাকেও একটা ভুতুড়ে শহরের মতই মনে হয়। লাকসাম একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। এর কাজকর্ম ও ব্যস্ততা দেখানোর কাজে বন্ধুটি লেগে গেল যদিও কোনো

রেলগাড়ি বাস্তবে চলাচল করছিল না। আমার ঐ ক্যামেরাম্যান বন্ধুটি সেনাবাহিনীর সহায়তায় দুটি বগীওয়ালা রেলগাড়ি স্টেশনের বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন এবং ঘটনাটি রেকর্ড করলেন। ঠিক একইভাবে 'শান্তি কমিটি'র লোকজনের সাহায্যে তিনি এক বিরাট গণজমায়েত দেখালেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম সেখানে এ ধরনের কোনো জমায়েতের অস্তিত্ব ছিল না। সে অঞ্চলের শুদ্ধি অভিযানের ভারপ্রাপ্ত মেজর কিন্তু জাদু জানতেন। একজন পুরানো ও অনুগত মুসলিম লীগ অনুসারী বৃদ্ধকে লোক জমায়েত করতে বলা হলো। লোকটি সেনাবাহিনীর কাজে লাগতে পেরেছে বলে হাজার শোকর জানাতে লাগলো। সে বললো, এক থেকে দু'শ লোক জমায়েত করতে তার তিন চার ঘণ্টা লাগবে। মেজর তাকে আধঘণ্টা সময় দিলেন এবং সঙ্গে একজন জোয়ান পাঠিয়ে এর সাফল্যের সহায়তা করলেন। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পরই অদূরে জনকলরব শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে বিভিন্ন পোশাক পরিহিত আবালবৃদ্ধের একটি দল পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে দেশাত্মবোধক শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসে। শান্তি কমিটির লোকগুলো এসে উপস্থিত হলো। এখানে বড়জোর পঞ্চাশজন আবাল বৃদ্ধ উপস্থিত হয়ে থাকবে। ঐ টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান খুব দক্ষতার সঙ্গে তার ক্যামেরা চালাতে পারতো কাজেই সে একটা থানার সামনে লোকগুলোকে জড়ো করলো এবং একটি বিরাট জনসভার ছবি তুললো। তারপর একটা সংকীর্ণ পথ খুঁজে বের করলো। ঐ পথে লোকগুলোকে কয়েকবার আসা-যাওয়া করিয়ে দক্ষতার সাথে তার ক্যামেরাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কাত করিয়ে মিছিলের ছবি তুললো। চারদিন পর করাচি টেলিভিশনে লাকসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে দেখানো হলো এবং এভাবেই চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেটের অবস্থা একই পদ্ধতির অনুসরণে দেখানো হলো। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য শহরগুলো ছিল পুরোপুরি ভুতুড়ে শহর। কেননা ওসব শহরের লোকগুলো গ্রামে-গঞ্জে পালিয়ে রয়েছে। কিংবা সীমানা পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এর পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি সাংবাদিকদের শাসকচক্র সতর্কতার সাথে বাছাই করে পূর্ব বাংলার অবস্থার অনুরূপ প্রতিবেদনের জন্য সফরে পাঠালেন। বাঙালি সাংবাদিকদের নেওয়া হতো না, কেননা তারা নির্ভরযোগ্য নন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকায় সিনিয়র বাঙালি সাংবাদিকদেরকেও কাজ করতে দেয়া হতো না। আমাকে বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ সাফল্যের সাথে এঁদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে। এজন্য এদের কোনো সরকারি কাজে লাগানো যাবে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিচার-বুদ্ধি বৃত্তিকে এমন অপদস্থ হতে আমি আর কখনো দেখিনি।

সংবাদপত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কোনো নতুন ঘটনা নয়। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার অধিগ্রহণের পর থেকে সংবাদপত্রগুলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের একমাত্র নিরপেক্ষ 'দৈনিক পাকিস্তান টাইমস' সরকার দখল করে নিলে ইচ্ছা প্রণোদিতভাবেই এর অবলুপ্তি ঘটান হয়। অন্যান্য পত্রিকাগুলোতে কোনো অসুবিধা ছিল না। অধিকাংশ

সংবাদপত্রের মালিকানা ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্যই হোক বা অন্য যেসব ব্যবসা শুরু করেছেন সেসবের সাফল্যের জন্য হোক সরকারের সুরে সুর মিলানোকে সুবিধাজনক মনে করলেন। সরকারের শীর্ষপদের সামান্যতম সমালোচনা কিংবা অসম্মানজনক সমালোচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কোপানলে পড়তে হতো। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছালো যে প্রচারণা কাজে সম্পাদকবৃন্দ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অভিপ্রেত প্রচার মাত্রাকেও অতিক্রম করলেন।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা চালাতেন এমন একজন সম্পাদকের কথা আমি হুবহু মনে করতে পারছি, তিনি দু'টি রেজিস্টার তাঁর দফতরে রাখতেন। একটি রেজিস্টারে তিনি সরকার সমর্থক প্রতিবেদনগুলো তালিকাভুক্ত করতেন, আর অন্যটিতে ছিল বিরোধী দলের নেতাদের অসম্মানজনক প্রতিবেদন। ভুট্টো সাহেব ছিলেন দুই নম্বর তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আমার ঐ বন্ধুটি ঐ তালিকার খালি জায়গায় ধারাবাহিকভাবে ভুট্টোবিরোধী কাহিনীগুলো লিখে রাখতেন। এই রেজিস্টারের মাসিক প্রতিবেদনগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রেসট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যানের অবগতির জন্য পাঠাতেন। তিনি দৈনিক সরকার সমর্থিত কাহিনীগুলো চয়ন করে সংবাদাকারে সম্পাদকের শুভেচ্ছাসহ যথাযথ সরকারি কর্মচারীর নিকট পাঠাতেন। নির্বাচন যখন আরেকবার ভুট্টোকে ক্ষমতাসীন করলো, তখন ঐ ভদ্রলোকটি যিনি এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনের একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক ভাষ্যকার, তার রেজিস্টার ও মানসিক রিপোর্টগুলো উদ্ধার করতে কি কঠোর শ্রমই না করেছেন।

আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব পথে চলতে থাকায় সরকারের জন্য প্রকৃত চিত্রটা বিকৃত করতে আরো সুযোগ দিল। একদিকে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনোত্তর পশ্চিম পাকিস্তান শহরে যেতে কঠিনভাবে অস্বীকার করায় সরকার এ ঘটনাকে পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে শেখ মুজিবকে চিহ্নিত করার সুযোগ পায়। শেখ মুজিব যদি ঐতিহাসিক নির্বাচন বিজয়ের পরপর পশ্চিমাঞ্চলে সফরে যেতেন তাহলে সেখানে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে হতো এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সরকারি প্রচারণার এ সাফল্যকে তিনি খণ্ডন করতে পারতেন। অপরদিকে মহান আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ জারি করেন। এতে পূর্ব বাংলা বাস্তবক্ষেত্রে দেশের অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী এই ধারণাটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী নারকীয় নৃশংসতার প্রথম ক'মাস এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরেছে, তারপরও সরকারি প্রচার মাধ্যম নিপুণভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিল যে, যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নেই। এবং তারা বিশ্বাস করছে সরকারের যা কিছু করা হচ্ছে সরকার ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় একতা ও সংহতি

বজায় রাখার কারণেই করছেন। এক্ষেত্রে জনৈকা পাঞ্জাবী মহিলার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে বলতে পারি। এ ভদ্র মহিলা আমার পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাঁর পদমর্যাদা ও মানবিক সহমর্মিতার কারণে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। যখন আমি তাঁকে পূর্ব বাংলায় পাকবাহিনী কী ঘটিয়েছে তা বললাম তিনি মেজাজের সাথে উত্তর দিলেন, ওরা ওটা পাওয়ার যোগ্য। তারা যদি স্বাধীনতা চায় তবে মৃত্যুর জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

এমন কি যারা আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াও একই ধরনের। কেউ কেউ তো আমাকে 'ভারতীয় চর' ও 'বিশ্বাসঘাতক' বলে গালমন্দ করেছে। আমি যখন *সানডে টাইমস্*-এ এই গণহত্যার কাহিনী লিখলাম তখন তাদের কাছ থেকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় চিঠি পেতে থাকলাম। তবে এটা ঠিক, তারা যেটা বিশ্বাস করতো, তার প্রতি তারা আন্তরিক ছিল। এছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া হলো ভীতিজনক। তাছাড়া বাঙালিদের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর কী করেই বা আশা করি? আমি আবার বলছি গোয়েবলসও অতটা সুচারুভাবে করতে পারতেন না যতটা পাকিস্তান সরকারের প্রোপাগান্ডাকারীরা করেছে।

তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানে এমন লোক এখনো আছে যাঁরা বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু আমার সন্দেহ নেই যে, তাঁদের মতামত প্রকাশের কোনো উপায় নেই। কেননা সরকারের কাজের সামান্যতম সমালোচনা জাহান্নামের দরজা খুলে দেবে। অর্থাৎ চরম নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাদির মুখোমুখি হতে হবে।

এমতাবস্থায়, পশ্চিম পাকিস্তানীরা নীরবদর্শক হয়েই রইলেন। আমি তাঁদের নীরবতার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। কিন্তু আমি এটার কারণ উপলব্ধি করি।

আশি লাখ লোক কেন মারা যাবে ?

'চিন্তাতীত অনুপাতের এক মানবীয় দুর্যোগ...'
–বার্নার্ড ব্রেইন, এমপি

১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে এপ্রিল '৭১ পর্যন্ত এ ছ'মাসের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে দুটো বড় দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমটি হলো এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যখন এই দানবীয় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এ জনাকীর্ণ উপকূলীয় এলাকাগুলো গ্রাস করে এবং অগণিত প্রাণের অকাল মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয় দুর্যোগটি মানুষের তৈরি, সামরিক শাসকচক্র রাজনৈতিক সমস্যাকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে দিয়ে অবিশ্বাস্য নৃশংস গণহত্যা অভিযান করে সমাধান খুঁজতে এ দুর্যোগের সৃষ্টি করেছে। আশি লাখেরও বেশি ছিন্নমূল বাঙালি দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। আরো বহু সংখ্যক বাঙালি পালাবার পথে রয়েছে। কত লোক নৃশংসতার শিকার হয়েছে তার হিসাবও কখনো জানা যাবে না। লক্ষ লক্ষ লোক হারিয়ে গেছে চিরতরে, ঠিক যেমনটি গত নভেম্বর '৭০ সালে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হারিয়ে গিয়েছিল।

এখন এই দুর্যোগ তৃতীয়বারের মতো আঘাত হেনেছে।

পূর্ব বাংলা এখন প্রায় দুর্ভিক্ষের কবলে। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছিল এবারের দুর্ভিক্ষ তারচেয়েও গভীর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ত্রিশ লাখ লোক মারা গিয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ পাকিস্তান-ভারত উভয় দেশের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এতে আনুমানিক আশি লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে কিংবা অকর্মন্য হয়ে পড়বে। এটা বাস্তবক্ষেত্রে চিন্তাতীত অনুপাতের এক মানবীয় দুর্যোগ। দুর্ভিক্ষ যে বাস্তবে এসে গেছে–নারী পুরুষ শিশুদের শীর্ণদেহ দেখলেই তার প্রমাণ মিলবে। বিশেষ করে যারা ভারতে পাড়ি দিয়েছে তাদের অস্থিচর্মসার দেহে বেদনাঘন পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব শরণার্থীদের প্রথম দুটো দল ছিল নিঃস্ব ও রুগ্ন, তারপরে যারা যাচ্ছিল তাদের মতো অতটা শীর্ণ ছিল না। পূর্ব বাংলায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও গৃহযুদ্ধের (স্বাধীনতা যুদ্ধ) অপরিহার্য পরিণতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে শুরু করেছে। এই করুণ দুর্ভিক্ষাবস্থা পাকিস্তান সরকার মেনে নিতে রাজি হলো না। ফলে অনাহারী জনগণের মর্মান্তিক দুর্দশাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এটা মেনে নেয়ার অর্থ হলো, অপরাধ স্বীকার করাই বোঝাবে না বরং পূর্ব বাংলায় চলমান সামরিক বর্বরতা মেনে নেবার পক্ষে আন্তর্জাতিক মনোযোগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সে কারণে পূর্ব বাংলার লোকদের অবশ্যই

মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। চিরাচরিতভাবে অনুন্নত এলাকায় দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমেছে, খাদ্যকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেননা যাতে করে ৬.৬ কোটি বাঙালিকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা যায়। কৃষি উন্নয়নের একজন অবাঙালি অফিসারকে আমি বলতে শুনেছি, 'দুর্ভিক্ষ' হলো আমাদের আয়োজিত ধ্বংসাত্মক কাজেরই ফল। কাজেই ওরা অনাহারে মরুক। তখন বাঙালিদের চেতনা ফিরবে। এই হলো সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব, সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্য ঘাটতির গভীর সংকটাবস্থা। তাতে সরকারি উদাসীনতা ও খাদ্য সংকট আরো জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই পূর্ব বাংলার ১৭টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এমনকি শস্যের ফলন ভালো হলেও ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য বিশেষতঃ চাল আমদানি করতে হয়। অদূর অতীতে পূর্ববাংলা একের পর এক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ায় আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ব্যাপক পরিমাণে। পাকা ধানের মৌসুমে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় মরণ ছোবল হানে। এ দুর্যোগ শুধু খাদ্যশস্যের ব্যাপক ক্ষতি করেনি, সে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসে এসেছে লবণাক্ততা, যা গোটা উপকূলীয় বৃহত্তর অঞ্চলজুড়ে স্বাভাবিক ধান উৎপাদনকে অসম্ভব করে ফেলেছে।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে রয়েছে চলমান গৃহযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ। বিগত মার্চ মাসে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বাঙালির গণঅভ্যুত্থানে প্রদেশের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে যা কোনো ঘূর্ণিঝড়ে অতটা ক্ষতি করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য বাঙালি গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা রাস্তা ও ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে। এই নদীমাতৃক প্রদেশের অনেকগুলো ফেরী চলাচল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে খাদ্যশস্য শতাধিক বিতরণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রধান সড়কের চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর কাছ পর্যন্ত এই ৩০ মাইল পথে কমপক্ষে একশ' ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালান হয়েছে। আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের শতকরা ৮০ ভাগ রেলপথে ও ট্রাকে পরিবহন করা হয়। বাকি ১৫ শতাংশ বার্জে নদীপথে বহন করা হয়। এ দুটো পরিবহন ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাপ্লাইয়ের কারণে সে সুযোগ সহজলভ্য নয়। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের সাইলো (খাদ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র)-গুলোতে খাদ্যশস্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে অথচ প্রদেশের অন্যত্র ঘাটতি চরমে উঠেছে। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা প্রধান সড়কের অনেক ক্ষেত্রে মেরামত করা হয়েছে, এখনো যেকোনো সময়ে গেরিলা আক্রমণের শিকার হতে পারে। স্বাভাবিক যানবাহনের একটি নগণ্য অংশ চলাচল করছে।

প্রদেশের অন্যত্র একই ধরনের বাধাবিপত্তিও রয়েছে। গত গ্রীষ্মে একটি আন্তর্জাতিক জরিপ থেকে জানা যায় যে, দেশের ৬০ শতাংশ খাদ্যশস্য দক্ষিণাঞ্চলে গুদামজাত থাকে। অথচ ঐ অঞ্চলের প্রয়োজন মাত্র প্রদেশের মোট চাহিদার ৩০ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছিল বিশেষত পোড়ামাটি নীতি চলতে থাকায় রেল ও নদীপথ ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য সরবরাহ বজায় রাখাটা সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ও বেসামরিক প্রশাসনের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য

জিনিসপত্রের চাহিদা মেটানো হতো যখন যতটুকু পাওয়া যেতো তার ভিত্তিতে। অবশ্যম্ভাবীভাবে জনসাধারণের চাহিদার ঘাটতি থেকেই গেল।

সেপ্টেম্বর '৭১ সালে আরো দুটো উপসর্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে যোগ দিল। প্রথমটি হলো আউশ চাষের জন্য বীজধান ও কৃষি উপকরণের অভাব। একদিকে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে অন্যদিকে কৃষকদের অনীহার জন্য সেগুলো সুলভ ছিল না, তাছাড়া কৃষকেরা নিজেদের মজুত শস্য ফেলে রেখে অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়টি হলো মজুতদারি। উৎপাদনকারীরা ঘাটতি বছরে চিরাচরিত নিয়মে মজুত করে থাকে। বোধগম্য কারণে তারা তাদের খাদ্যশস্য নিশ্চিত রাখতে চায়। এমনকি শহরের পয়সাওয়ালা শ্রেণিও তাই করে থাকে; তারা খাদ্যশস্যের যেকোনা মূল্য দিতে রাজি থাকে।

তৃতীয়ত, উপসর্গটি হলো অনাহারী লোকদের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এসব ক'টি উপসর্গ একত্র হয়ে ১৯৭১ সালের শীতের সময়টা আরো সংকটপূর্ণ সময় হয়ে দাঁড়াবে।

পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনকালে অর্থাৎ ১৯৬৬-১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব গড়ে প্রতি বছর এক কোটি আশি লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সত্ত্বেও বার্ষিক ঘাটতি ছিল ১২ লক্ষ টন। অদূর অতীতে দুর্যোগগুলো অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরের বন্যা, নভেম্বরের ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে সামরিক বাহিনীর ধ্বংশাত্মক বর্বরতা এসবের সমন্বিত কারণে ১৯৭১ সালের প্রত্যাশিত উৎপাদনের ২০ শতাংশ হ্রাস পায়। পরপর দুটো বছরই খাদ্যোৎপাদনের অবস্থা খারাপ থাকায় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টন অর্থাৎ ২৮ বছর আগে মহাআকালের বছরের পর এই বছরই সবচেয়ে কঠিন খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। এ সবকিছু মিলে অদ্বিতীয় মানবীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করলো। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা স্বীকার করতে নারাজ। যার ফলে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো তাদের তৎপরতা সুচারুভাবে করতে পারলো না।

এহেন পরিস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী যতটুকু পাওয়া যাবে তাও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সেটুকু বালিতে পানি ঢালার মতো হারিয়ে যাবে। সেগুলো হয় পাক সেনাবাহিনী বা দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা এবং বিবেক বর্জিত ব্যবসায়ীরা কালোবাজারে ঐসব খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে ফায়দা লুটবে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য ত্রাণ সংস্থা আশানুরূপ উদ্দেশ্য সাধন করতে চান। তাহলে এসবের তত্ত্বাবধানের কাজ আন্তর্জাতিক তদারকিতে হতে হবে, গৃহযুদ্ধে লিপ্ত দলগুলোকেও তাদের সহযোগিতা করতে হবে। যাতে খাদ্য সামগ্রী পরিবহনে ও বিতরণে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়। নতুবা যে করুণ দুঃখজনক পরিস্থিতির ছবি আঁকা হয়েছে আগত মাস ও বছরের কঠিন সময়ে তা বাস্তবে রূপলাভ করবে। এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আগত দিনে পূর্ব বাংলাকে আঘাত হানবে যা অতীতের সকল দুর্যোগকে অতিক্রম করবে।

কেন বাংলাদেশ?

"পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের
লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে।
... স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য।"

–তাজউদ্দীন আহমদে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তান-এর বর্তমান আকারে পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের হাতে নিহত হয়েছে, যখন এর সশস্ত্র বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানে। পাকিস্তান আর কখনো এর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না।

–হরপাল ব্রার
লন্ডনস্থ 'অ্যাসোসিয়েশন অব কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স'-এর
সভায় Maoist Position সম্পর্কে ১৯৭১ সালের
৯ জুলাই প্রদত্ত বিবৃতি।

বাংলাদেশ কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের সৃষ্টির কাঠামোর মধ্যেই খুঁজে দেখতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশ শাসক এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর যাতে তারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে। দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিরোধের ভাব বিদ্যমান ছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁছে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ, হিন্দু ও মুসলমানেরা ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই হিন্দু মুসলমান শত্রুতার ওপর পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে। যেই মাত্র মুসলিম লীগের দাবি যা, দেশ বিভাগের যুক্তিকে সমর্থন করেছে সেইমাত্র তা নবীন রাষ্ট্রকে একটা আদর্শগত রূপ দেয়ার বিষয়ে পরিণত হলো। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চ ও এর পরবর্তীকালের ঘটনাবলী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং আদর্শগত উদ্দেশের মূলে কুঠারাঘাত করলো।

দু'দশকের শোষণ ও অবমাননার লক্ষণ এবং এখন যে গণহত্যার মতো চরম বর্বরতা চলছে তারপর এই মুসলিম রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ লোক তাদের স্বদেশবাসীর কাছ থেকে কেবল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নই হয়নি, তারা তাদের ইসলাম সমধর্মাবলম্বী ও স্বদেশবাসীর বর্বরতার বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের নিকট আশ্রয় চাইতে বাধ্য হয়েছে। উপমহাদেশে যারা বাস করছেন, তাঁরা এ দৃশ্য দেখে পাকিস্তানের সামগ্রিক ধারণাকে উপহাস বলে মনে করেছেন। পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমি

ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে এর সৃষ্টির আদর্শও। ইসলাম কখনো এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কিংবা তাকে সমূলে ধ্বংস করতে উৎসাহ দেয় না। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে তাদের আলাদা পথে যাওয়া থেকে কোনো কিছুই বিরত করতে পারে না।

এভাবে বাংলাদেশ বাস্তবে ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নরূপ লাভ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার আনুষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতা কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। দু'অঞ্চলের মানসিক ও আবেগগতভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

পাকিস্তানের এহেন পরিস্থিতিতে অগ্রগতির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পরিচালিত বর্তমান সামরিক শাসকচক্রের ওপরই বর্তায়।

নিজের গদি এবং পাকিস্তানের সবকিছুর ওপরে সেনাবাহিনীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য ইয়াহিয়া খান যে মতলব এঁটেছিলেন তাই তাঁকে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ বানচাল করার কৌশল উদ্ভাবনে পরিচালিত করেছে। রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যই তিনি সতর্কতার সাথে নানা ফন্দি এঁটেছিলেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ছিল তাঁর পরিকল্পনার পথে বেদনাদায়ক অন্তরায় স্বরূপ; কিন্তু তাতে তাঁর উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়নি। শুধু এর কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াইকে ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করা হলো। এতেও যখন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে টলানো গেল না তখন সামরিক সরকার তার মতলব হাসিলের জন্য হঠকারী সামরিক অভিযানকে অবলম্বন করলো।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ তারিখে যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করা হলো, তখন থেকেই ধ্বংসের সূচনা হয়। ২৫ দিন পরে ধ্বংস এলো তার নিজের পথ ধরে, যখন পূর্ব বাংলার সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হলো। এই সমাধানের অর্থ ছিল বিরোধী পক্ষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং প্রদেশটিকে পশ্চিম পাকিস্তানের চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করা—সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের সবকিছুর শীর্ষে অধিষ্ঠিত করা।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর এই সামরিক শাসকচক্রই অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করে। নির্বাচন পরিচালিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে, একজনের এক ভোট এই নীতিতে—তা সে যে অঞ্চলেই বাস করুক না কেন। এই নীতি ভৌগোলিক পার্থক্য ঘোচাতে সাহায্য করেছে। প্রেসিডেন্ট নিজেই সংখ্যাসাম্য নীতি বাতিল করে দিয়ে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন, যা কেন্দ্রীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। প্রতিনিধিত্বের এই নতুন বিতরণ ব্যবস্থা একথা স্থির করে দেয়নি যে উভয় অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি থাকতেই হবে। দলগত উদ্দেশে সমগ্র দেশকে একক হিসেবেই ধরা হয়েছিল।

নির্বাচনের পর হঠাৎ এই ধারণার পরিবর্তন করা হলো। দেশের অর্ধেকের চেয়েও বেশি জনসংখ্যার রায়সহ নির্বাচনে জয়লাভ করায় আওয়ামী লীগ বৈধভাবে ৬-দফা সহ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও শাসনভার গ্রহণের আশা করেছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাতে বাধ সাধলেন। তিনি আওয়ামী লীগকে বললেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি আসনও না পাওয়ায় এই দল কেবল বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পরিষদে বসার আগেই এই দলকে শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট বলতে চাচ্ছিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ ভিন্ন প্রকৃতির ও পরস্পর বিরোধী। একজনের এক ভোট নীতি তামাশায় পরিণত হয়েছে। তাঁর এই উদ্ভট যুক্তি কেবল গণতান্ত্রিক রীতিকেই অস্বীকার করেনি, এটা দেশের অখণ্ডতাকেও অস্বীকার করেছে। কাজেই পরবর্তীকালে বাঙালিরা যদি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে দোষী করা যায় না।

শেখ মুজিবের বিচার হয়েছে এবং তিনি সামরিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিনাশের প্রচেষ্টার অপরাধে অপরাধী বলে প্রমাণিত হবেন। আসলে তিনি নিরপরাধ। প্রকৃত অপরাধ করেছে অন্যে ইয়াহিয়া সামরিক শাসকচক্র।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে অকপটভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক মীমাংসার পক্ষে কাজ করেছেন এবং একমাত্র এভাবেই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা যেত। ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন 'শেখ সাহেব, আমাকে বলুন, আপনি কী এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন?' মুজিব এর উত্তরে বলেছিলেন : 'খান সাহেব, আমি একজন মুসলিম লীগ পন্থী'। মুজিবের উত্তরের তাৎপর্য এই যে, খান ওয়ালী খান ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন বলে তিনি তাঁকে মৃদুভাবে ভর্ৎসনা করলেন (যে জামায়াতে ইসলামী এখন নিজেকে পাকিস্তানের আদর্শের রক্ষক বলে দাবি করে থাকে, সেই দলও ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেছিল) এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি অর্থাৎ শেখ মুজিব কেবল পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি, এখন পর্যন্ত তিনি এর প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার প্রতি অনুগত আছেন।

এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী যখন ঢাকার বুকে আঘাত হানে, তখন পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি আনুগত্যই শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের মুখে ঠেলে দেয়। অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে তিনিও সহজেই পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে গা-ঢাকা দিতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্টভাবে নিজের জন্য বেছে নিলেন বন্দিজীবন। কারণ তিনি পাকিস্তানকে খণ্ডিত করতে চাননি। আমি এই মতবাদ মেনে

নিচ্ছি না; তবে এর উল্লেখ করছি এজন্যে যে এটা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা মুজিবের স্বদেশপ্রেমকে সমর্থন করা যায়।

অধ্যাপক জি.ডাব্লিউ চৌধুরী যে মন্তব্য করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে তা পুনরায় উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা আশা করি যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় (জাতীয় পরিষদে) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বলে কোনো কিছু থাকবে না। তার পরিবর্তে এর বিকাশ ঘটবে দলগুলোর ভিত্তিতে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, আমরা আশা করি এই সাধারণ পার্থক্য থাকবে না। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের একটি মাত্র দলে সংঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতার মোকাবেলা করার প্রশ্নই উঠে না। যদি তা-ই হয়, তাহলে এর অর্থ হবে পাকিস্তানের বিলুপ্তি।' (দি পাকিস্তান সোসাইটি বুলেটিন : ৩১ সংখ্যা; পৃষ্ঠা-৩৩, লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০)

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকার একজনের এক ভোট নীতির রায় গ্রহণ করেনি। ওটা স্বীয়স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে ত্বরান্বিত করেছে এবং রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকারি দলই অপরাধী, শেখ মুজিবুর রহমান নন। আওয়ামী লীগ প্রধানের পরিবর্তে এই সামরিক-চক্রের দলেরই বিচার হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন করে বলে তারাও অপরাধের অংশ থেকে রেহাই পেতে পারে না। তারা একথা না-ও মানতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য কাকে দোষী করা যায়, সেই ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সমগ্র বিশ্বে কোনো মতভেদ নেই।

কয়েক মাস ধরে ভয়াবহ অত্যাচার চলার পর এখন বিশ্ব জনমত পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য জোর চাপ দিয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য হলো অবিরাম সামরিক বর্বরতা বন্ধ করা এবং এভাবে ভারতে অবস্থানরত আশি লাখ পরবর্তীতে এক কোটি শরণার্থীকে পূর্ব বাংলায় তাদের ঘরে ফিরে যেতে দেওয়া।

কিন্তু একটি রাজনৈতিক মীমাংসা কী সম্ভবপর?

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে অখণ্ড পাকিস্তানের চৌহদ্দির মধ্যে কোনো মীমাংসাই সম্ভব নয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে, যা জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। বাঙালিরা সর্বত্রই এ কথার ওপর জোর দিয়ে আসছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কিছুতেই পুনর্মিলন ঘটতে পারে না। আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের কথা বলতে গেলে তারা বাঙালিদের জন্য একটিও সহানুভূতির কথা বলেনি এবং স্পষ্টতই তারা পুনর্মিলনের জন্য উদ্যোগী হতে অপারগ। এমন একটি অসম্ভব ঘটনা যদি ঘটে যায় যে, সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়েছে এবং ঢাকায় তাঁকে প্রশাসনিক প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত করেছে, তথাপি ঘড়ির কাঁটা ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। ২৫ মার্চ থেকে বাঙালিরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তারপরে বঙ্গবন্ধু শত চেষ্টা করলেও তাদেরকে অখণ্ড পাকিস্তান গ্রহণে সম্মত করাতে পারবেন না।

একটিমাত্র মীমাংসাই বাঙালিরা গ্রহণ করবে, তা হলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এরূপ ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করার কোনো সুযোগই থাকবে না। দুটি অংশের মধ্যে যে ঘৃণা বিরাজমান তা খুবই গভীর বলে ঐরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়।

একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর যেকোনো পদমর্যাদার লোক পূর্বাঞ্চলীয় শাখার বিচ্ছিন্নতায় সম্মত হতে পারে না। সেনাবাহিনীর বেলায় একথা আরো বেশি সত্য, যারা এখনো ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত আছে। পূর্ব বাংলায় 'শুদ্ধি অভিযানে' পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অসংখ্য লোক হতাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এ সমস্ত ক্ষতি কোনোক্রমেই গলাধঃকরণ করতে পারবে না এবং শান্তভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের ঘরে ফিরে যাবে না। পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার আগে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে যেকোনো আলোচনা পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত যেকোনো রাজনীতিবিদের জন্য হবে আত্মঘাতী ব্যাপার। কাশ্মীরের অভিজ্ঞতা তা নিশ্চিত করেছে। ২৩ বছরের মধ্যে কোনো সরকারই কাশ্মীরের ব্যাপারে 'নমনীয় নীতি' গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এমতাবস্থায় স্বাধীন পূর্ব বাংলা সম্পর্কে প্রস্তাবের কথা আরো বেশি অচিন্তনীয়। তাহলে সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে আসবে। একথা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের নিকট সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি বাঘের পিঠের ওপর উপবিষ্ট আছেন।

কোনো অলৌকিক ঘটনার বলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যদি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশ থেকে একই দাবি উত্থাপিত হবে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান ওয়ালী খান বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যদি পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়, তবে এর সংখ্যা হবে পাঁচটি।' বাঙালিদের মতোই বেলুচি, সিন্ধি এবং পাঠানরাও সবসময়ই পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছে। পনের বছর তারা অখণ্ড পশ্চিম পাকিস্তানের (যা এক ইউনিট নামে পরিচিত) বিরুদ্ধে এমনভাবে সংগ্রাম করেছে যে, ইয়াহিয়া খান তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন এবং ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে এক ইউনিট ভেঙ্গে দেন। নির্বাচনের সময় এই প্রদেশগুলো সতর্কতার সাথে শেখ মুজিবের প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ছয় দফা দাবির স্বীকৃতি তাদের জন্য নিয়ে আসবে পাঞ্জাবি আধিপত্য থেকে মুক্তি, দীর্ঘদিন ধরে তারা যার প্রত্যাশা করেছিল। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কয়েকজন স্বতন্ত্র সিন্ধি রাজনীতিবিদ প্রকাশ্যেই শেখ মুজিবের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র সমর্থন করেছেন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে তারা তাঁর সাথে হাত মেলাবেন। পূর্ব বাংলায় সামরিক বর্বরতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো এই মুহূর্তে মুখ বন্ধ

রেখেছেন। যাহোক কেন্দ্রমুখী প্রবণতাগুলো থেকেই গেল এবং যেকোনো অবস্থায় পূর্ব বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারাও একইরূপে পশ্চিম পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সামরিক সরকার বেদনাদায়কভাবে সে সম্পর্কে অবগত আছে। এই সরকারের প্রচেষ্টা হলো যেকোনো মূল্যে এই প্রদেশগুলোকে একত্রে রাখা। এই অভিপ্রায়ে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন সম্পর্কে কিছু জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে, ঠিক যেভাবে মিসর, লিবিয়া ও সিরিয়া একটি কনফেডারেশন গঠন করেছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনটি যুক্তিকে উপস্থাপিত করা হয়।

প্রথমত, একথা অনুভূত হয়েছে যে, নিকটবর্তী ইরানীয় অঞ্চলগুলোর সঙ্গে একটি ঐক্যজোট পাকিস্তান সরকারকে বিচ্ছিন্নতাবাদী চাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে সৃষ্টি হচ্ছে। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ক্রমাগত অস্বীকৃতির ফলে এই প্রদেশগুলোর অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একথা ভেবে দেখা হয়েছে যে, ইরানের সাথে একটি ঐক্যজোট অধিক নিরাপদের সঙ্গে তাদেরকে শান্ত করতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলায় ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে, বিশেষ করে ঐ গুরুত্বপূর্ণ বাজারটি ফলত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনীতিতে যে ভাঙন ধরেছে, এই ঐক্যজোট সামান্য পরিমাণে তার ক্ষতিপূরণ করবে। তৃতীয়ত, ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে এই ঐক্যজোট পাকিস্তানের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে মূল্যবান সাহায্য দান করবে। এমন কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান ইরানের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে প্রচুর সাহায্য পেতে পারে; যা তার শিল্প ও সেনাবাহিনীর জন্য অপরিহার্য।

এই 'ঐক্যজোট' নতুন কোনো ধারণা নয়। এর আগে ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার নির্দেশক্রমে পাকিস্তান সরকার ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে একটি কনফেডারেশন গঠন সম্পর্কে কার্যকরীভাবে আলোচনা করেছিল। তখন এর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের নির্ভরশীল হওয়া। এতে ফল কিছুই হয়নি; কারণ ইরানের শাসক রাজা শাহ আহমেদ পাহলভী ও আফগানিস্তানের রাজা উভয়েই 'বড় ভাই' সম্পর্কে বোধগম্যভাবে সন্দিহান ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় ধারণাটি পুনরায় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে। এইবার তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর প্রস্তাব আসে খান আব্দুল কাইয়ুম খানের কাছ থেকে, যাঁর মুসলিম লীগ দল এর নির্বাচন অভিযানে গোপনে জোর সরকারি সমর্থন পাচ্ছিল। ঘুড়ি বেশিক্ষণ পাক না খেয়েই মাটিতে পড়ে যায়। রাওয়ালপিন্ডির নির্দেশ থেকে সৃষ্ট গুজবের সাহায্যে ঘুড়ি এখন পুনরায় আকাশে উড়ছে। এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরানে তাঁর অনির্ধারিত সফরের সময় এই ধারণা সম্পর্কে ইরানের শাহের মত জানতে চেষ্টা করেন। শাহের প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাত, তাঁর কাছে আদৌ কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিনা, তাও জানা যায়নি। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এতে তাঁর কোনো লাভ হবে

না, বরং পঙ্গু পাকিস্তানের ভার বহন করতে গিয়ে প্রতিক্ষেত্রেই তাঁকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান সরকার গণতান্ত্রিক পোশাকের এক বিরাট প্রদর্শনী আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। পূর্ব বাংলার সামরিক বর্বরতা মূল্যবান পাট ব্যবসাকে ধ্বংস করে। ইহা অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলে এবং দেশের পক্ষে একটি সাধ্যাতীত আর্থিক বোঝায় পরিণত হয়। সর্বোপরি সামরিক নৃশংসতার জন্য অপমানিত বিশ্ব বৈদেশিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। এসবের ফলে দেশে এক নজিরবিহীন আর্থিক সংকট দেখা দেয়। সরকার কেবল আর্থিক পিপার তলানিই চেঁচে নিচ্ছে না, তার টাকার ভাণ্ডারও হতাশাব্যঞ্জকভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-৭২ আর্থিক বছরের জাতীয় বাজেটে এমন কঠোর মিতব্যায়িতা দেখানো হয় যে, জয়েন্ট সেক্রেটারির নিম্নপদস্থ অফিসারদের বাসার টেলিফোন তুলে নেয়া হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল সরকারি কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির টাকা জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটের আকারে জমা দেওা হয়। নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য হঠকারী কর্মপন্থারই প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে সহজ ও কম কষ্টসাধ্য ছিল চুনকামের কাজ। একথা সরকারের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, একা কাউকে বোকা বানাতে পারেনি; বরং এর রাজনৈতিক দেউলেপনাই আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রথমত, ১৯৭১ সালের ২৮ জুন জনসাধারণের নিকট এই ওয়াদা করা হলো যে, 'প্রায় চার মাসের মধ্যে কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে বেসামরিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।' যখন অক্টোবর মাস ঘনিয়ে এলো, তখন সময়সীমা ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হলো। এর অজুহাত ছিল এই যে, প্রায় আশিজন আওয়ামী লীগ সদস্য অযোগ্য ঘোষিত হওয়ায় তাঁদের শূন্য আসন পূরণের জন্য উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই সদস্যগণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য "অপরাধী" সাব্যস্ত হয়েছেন। নতুন প্রার্থী পেতে সরকারের খুব বেগ পেতে হলো। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রের সাথে প্রকাশ্যভাবে সহযোগিতা করে খুব কম সংখ্যক বাঙালিই তাঁদের জনগণের কোপে পড়ার মতো ঝুঁকি নিতে চাইবেন। নিঃসন্দেহে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ আরো বিলম্বিত হবে।

প্রেসিডেন্ট 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' দ্বারা কী বুঝাতে চান, পাকিস্তানিরা তার একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছে। যেখানে নবনির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সেখানে ইয়াহিয়া খান বলেছেন যে, তিনি নিজেই জাতিকে একটি শাসনতন্ত্র উপহার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। জাতির উদ্দেশে তাঁর বক্তৃতায় তিনি নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলীর নাটকীয় পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'এই সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজ হবে দেশকে একটি কার্যোপযোগী শাসনতন্ত্র প্রদান এবং যে সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জনগণের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করে আসছে, সেগুলোর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।'

১৯৭১ সালের ২৮ জুন প্রেসিডেন্ট দেশবাসীকে বললেন যে, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ এবং সে কারণে 'একদল বিশেষজ্ঞের হাতে শাসনতন্ত্র তৈরি করা ছাড়া আমি আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না।'

এই শাসনতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ কী হবে তা তিনি পরবর্তী বিবৃতিতে প্রকাশ করেন। 'শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক এই শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা চলবে। কয়েকটি শাসনতন্ত্রের সতর্ক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এবং গত দু'বছরেরও অধিককাল আমি যেভাবে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের আকাঙ্ক্ষা নিরূপণ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতেও শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে।'

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের উদ্দেশ্য কী?

'জনগণের আকাঙ্ক্ষা' নিরূপণের উন্নততর পন্থার কথা আমি ভাবতে পারি না। জনসাধারণ কী চেয়েছিল, নির্বাচনের ফলাফল নিঃসন্দেহে তা দেখিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণের মতামতকে সহ্য করতে পারেননি এবং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব ফর্মূলায় ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

তিনি তাঁর পছন্দমত একটি শাসনতন্ত্র চান, যা এমন সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত হতে হবে যাতে তাঁর নিজস্ব পদমর্যাদা ও সেনাবাহিনীর প্রাধান্যের নিশ্চয়তা থাকবে। এমন একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণে পাকিস্তানিদেরকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানও ১৯৬২ সালে ঠিক তাই করেছিলেন এবং দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানও সাফল্য লাভের খুব কম অবশ্যই করতে পারেন, বিশেষত জনগণ যখন নির্বাচনে প্রথম গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রতি তথাকথিত অগ্রগতির আসল প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় পূর্ব বাংলায় নতুন গভর্নর ডা. এ. এম. মালিকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক সরকার দেখে। ডা. মালিক সকল ঋতুর উপযোগী লোক। তিনি এমন বিরল গুণের অধিকারী যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে যেকোনো সরকারের অধীনে তিনি কোনো না কোনো পদ অধিকার করেই আসছেন। তিনি নিঃসন্দেহে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের প্রতি যথোচিত রূপেই অনুগত থাকবেন এবং সামরিক আইন প্রশাসকরূপে এখন পর্যন্ত যার সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে সেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির জন্য প্রথম সারির যোগ্য ব্যক্তি হবেন। এটা আরো কৌতূহলজনক যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলায় 'বেসামরিক শাসন' প্রবর্তনে ইয়াহিয়া খানের কোনো অসুবিধা হয়নি, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে সেই শাসন প্রবর্তনকে তিনি অসম্ভব মনে করছেন। সেখানে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাদের সামরিক গভর্নরদের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে খুবই দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই

নেই যে ভুট্টো পর্যন্ত এটাকে 'চুনকাম' বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তানের ভাবী নকশার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তান ঃ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের সাথে ক্রমবর্ধমান বিরক্তিকর সম্পর্ক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনে ক্রমাগত অস্বীকৃতির প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো সীমান্ত এলাকায় ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দেখা দেবে এবং পাখতুনিস্তান (পাঠানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র) দাবির ওপর চাপ পড়বে।

নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকট সামরিক সরকারের জন্য সমানভাবে বিপজ্জনক। ইতোমধ্যে করভারে জর্জরিত জনসাধারণের ওপর আরো দুঃসহ করের বোঝা চাপানো হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জিনিসপত্র প্রাপ্যতার নিম্নগতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ফলে মারাত্মক শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলন দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এমন রোষবহ্নিতে পরিণত হতে পারে, যা কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এসবই সম্মুখস্থ শীতের মাসগুলোতে দেখা দিতে পারে, যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীন হয়ে পড়বে। ভারতের সাথে যুদ্ধের বিষয় তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। কারণ দেশের যে অংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটুকু সংযুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন উদ্বিগ্ন যে তিনি আরেকটি হঠকারী অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণে প্রবৃত্ত হবেন। ডেইলি টেলিগ্রাফের ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ 'বড়দিনের পর্বের' মধ্যেই আঘাত হানার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর ভেতরেই একটি বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ের জন্য রয়েছে এবং এরূপ বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পর অফিসার ক্যাডারদের মধ্যে একটি সাধারণ বুঝাপড়া হবে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান কেবল অকৃতকার্যই হননি; তিনি তাদেরকে বিক্রিও করে ফেলছেন। মনে হয় এমনটি ঘটতে বিলম্ব হবে। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেই তাহলে সেটা হবে পাকিস্তানে শান্তভাবে গদি পরিবর্তনের যে রীতি এতদিন প্রচলিত ছিল তার বদলে ইরাকে যা ঘটেছিল তার মতো রক্তক্ষয়ী ঘটনা।

পূর্ব পাকিস্তান ঃ সামরিক বর্বরতার ফলে সৃষ্ট ক্রমাগত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গেরিলা তৎপরতার বিস্তার লাভ। গেরিলারা প্রথম প্রথম এপ্রিল ও মে মাসে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে বিশৃঙ্খল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল, এখন তারা তারচেয়েও অধিক মারাত্মক হুমকি প্রদর্শনের মতো সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু দৃশ্যত তারা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সংগঠিত হতে পারেনি, কেননা তারা বর্ষা মৌসুমের পূর্ণতম সুযোগ পায়নি। সামনের মাসগুলোতে এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে; তখন তাদের কর্মতৎপরতা সম্ভবতঃ অধিক বিস্তার লাভ করবে এবং তা ফলপ্রসূ হবে। তখন উভয় পক্ষের জন্য এটা হবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যাকে অধিক বিস্ফোরণমূলক হেতুগুলোর মাধ্যমে অবিরাম সংঘর্ষ চালিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। এই হেতুগুলো হলো ভারতে ক্রমাগত শরণার্থী সমাগম এবং পূর্ব বাংলার ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর ভারতীয় ও পাকিস্তানি বাহিনীর

মুখোমুখি সংঘর্ষ। পরিস্থিতির এরূপ অগ্রগতির ফলাফল সম্পর্কে অনুমান করে কিছু বলা নিরর্থক হবে। বহু অনিশ্চিত হেতু রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামের সঙ্গে কিছু কৌতূহলজনক সম্ভাবনাও রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান হলো একটি প্রশ্ন ঃ সম্মুখস্থ দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের জন্য আওয়ামী লীগ কী ফলপ্রসূ নেতৃত্ব দিতে পারে?

এই দল একটা যুক্তিসঙ্গত উপসংহারে পৌঁছার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পে যতটুকুই আন্তরিক হোক না কেন, দলীয় কার্যাবলীর ওপর খুব বেশি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমি এই ধারণা যুবক ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে বহু বাঙালির কাছ থেকে পেয়েছি, এখন পর্যন্ত যারা ১৯৭১ সালের ১ ও ২৫ মার্চের মধ্যেকার দুঃখজনক ঘটনাবলীর কথা মনে করে দৃশ্যত ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে যে এই দল প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ জাগাতে পারে। কিন্তু সাফল্য লাভের জন্য এক যথোপযুক্ত তীক্ষ্ণতা দিতে পারে না।

সর্বাধিক চাপ ও স্বল্পতম প্রস্তুতি উৎপীড়িত জনগণের জন্য সহজে জয়মাল্য আনতে পারে না। এই কারণে হয়তো আওয়ামী লীগ অপরাধী। এর রাজনৈতিক সারল্য এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে এই দলের যে ব্যর্থতা তার চরম মূল্য বাঙালিদেরকে দিতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা এটাকে ভুলে গেছে, কিন্তু তারা অতীতের ভুলকে ভুলে যাওয়ার মতো বোকা হতে পারে না। কিংবা বাঙালি সৈনিকগণ যারা মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী ও মুখ্য অংশ, অথবা যুদ্ধরত ছাত্রনেতাগণ একথা ভুলতে পারে না যে, মার্চের সংকটময় দিনগুলোতে শেখ মুজিবের কাছ থেকে তারা উৎসাহ বা নির্দেশ যতটুকু লাভ করেছে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সেখানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণের জন্য দ্বিতীয় কোনো নেতা নেই। দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা কতকাল তাদের স্কন্ধে এই দলের বোঝা বহন করতে পারবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

অবশ্য বহুদূর থেকে আরাম কেদারায় বসে আমি এই ধারণা পোষণ করছি। এপ্রিলের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলার সীমান্ত এলাকাগুলো পরিদর্শনের সুযোগ পাইনি। কাজেই আমার মন্তব্যের সবটুকুই ভুল হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামকে জড়িয়ে যা চলছে সে সম্পর্কে কোনো বিতর্কের অবকাশ থাকবে না।

প্রথমত, বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য বিপ্লবাত্মক সাড়ারই প্রয়োজন হয়। সংগ্রামের ধরণ এবং এর বাহ্যিক রূপ এমন নির্দেশের বলে প্রভাবিত হবে, যা থেকে সর্বাধিক স্পন্দনশীল ও জোরদার সাড়া পাওয়া যেতে পারে। আওয়ামী লীগ যদি নিজেকে আরো গতিশীল ও বাস্তববাদী দল হিসেবে প্রমাণ করতে না পারে এবং যুদ্ধ করার মতো এর প্রবৃত্তি বৃদ্ধি না পায় তাহলে একদিন এর বোধোদয় হবে এবং এটা দেখতে পাবে যে নেতৃত্বের মশাল অন্যেরা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে, যারা এর প্রত্যাশায় কার্যক্ষেত্রে অপেক্ষা করছিল।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এতই বিস্ফোরণমূলক এবং এর ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এত অধিক মৃত্তিকান্তর রয়েছে যে, তা হয় আন্তর্জাতিক মতের নিচে চাপা পড়বে, নয়তো সংশ্লিষ্ট সকল দল একে অনায়াসে গ্রাস করে ফেলবে। এর প্রতিটি দিকই শরণার্থী সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, গণহত্যা, লাখ লাখ বাঙালির ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থা, স্বাধীনতার ধ্বংসাত্মক পরিণতি, যা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর পড়বে—বড় রকমের আন্তর্জাতিক সমস্যা। এসব সমস্যা একত্রে মিলে বিয়াফ্রা ও ভিয়েতনাম কিংবা বর্তমান যুগের লোকদের কাছে পরিচিত যেকোনো ঘটনার চেয়ে বৃহত্তর দুর্যোগ ও মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। এবং যদি কোনো অলৌকিক ঘটনার বলে এসব সমস্যার যথার্থ সমাধান হয়েও যায়, তথাপি একটি বিধ্বস্ত দেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের আহার, আশ্রয় ও বস্ত্রের সংস্থান কীভাবে করে তাদের সুখি করা যাবে। যাদের বেঁচে থাকার আশা পাটের সঙ্গে জড়িত, আর অনির্ভরযোগ্য সরবরাহ ও কৃত্রিম আঁশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই সোনালি আঁশের বাজার যখন একেবারেই নিচে নেমে গেছে।

আমরা সবেমাত্র একটি নতুন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্যের শুরু, সেখানে পৌঁছাতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে।

অনুবাদকের মন্তব্য

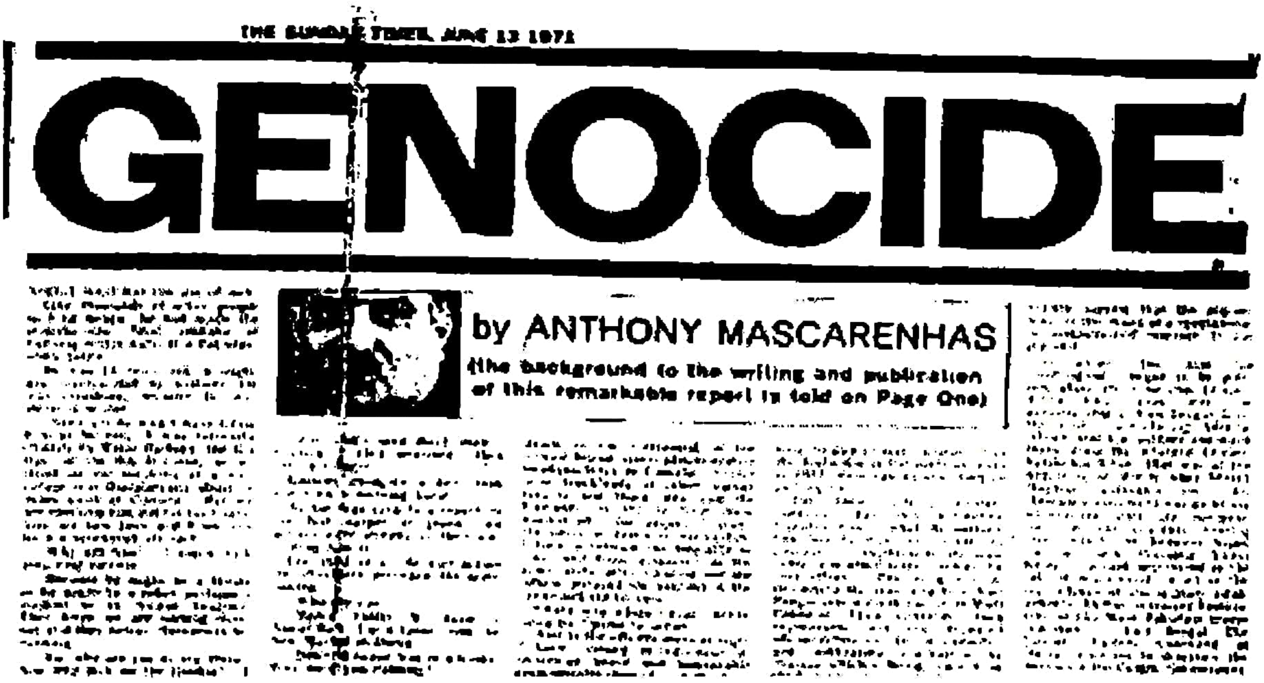

THE SUNDAY TIMES, JUNE 13 1971

GENOCIDE

by ANTHONY MASCARENHAS

(the background to the writing and publication of this remarkable report is told on Page One)

লন্ডনস্থ 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকার ১৩ জুন ১৯৭১-এ প্রথম পাতায় বাংলাদেশের পাকবাহিনীর নারকীয় গণহত্যার সাড়া জাগানো সংবাদ শিরোনাম "জেনোসাইড"।

বইয়ের শেষ লাইন দুটি "আমরা সবেমাত্র একটি নতুন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্যেও শুরু, সেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লাগবে।" অনুবাদ করার সাথে অনুবাদকের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য, একাত্তরের অক্টোবর মাসে দিল্লিস্থ বিকাশ পাবলিশিং হাউজ থেকে অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের : "দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ" প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এই বইটি প্রথম বই। প্রকাশনার পর বইটি সকল মহলে সাড়া ফেলে। তিনি শেষ কথাটি লিখেছিলেন : "আমরা সবেমাত্র একটি নতুন অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করেছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্যের শুরু, সেখানে পৌঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে।" সময় লেগেছে ঠিকই তবে মাত্র দেড়মাস, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। তাঁর এই শেষ লাইন দুটির প্রেক্ষিতে অনুবাদক হিসেবে নয় , মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে আমার বক্তব্য : চারদশক পরে সেসম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। অ্যান্থনির বিশ্বে সাড়া জাগানো প্রতিবেদন "জেনোসাইড" বা গণহত্যা ১৩ জুন, ১৯৭১ লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসেন। ভারতীয়

সংসদে আলোচনা হয় । ১৮ জুন, ১৯৭১ : ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে বিরোধী দলীয় সদস্য শ্রী সমর গুহর উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোচনাক্রমে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী লোকসভায় বলেন ঃ 'আমি শ্রী সমর গুহকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রস্তাব এনে এই সংসদকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাব সরকারকে নতুন পরিস্থিতির ওপর তার নীতি ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছেন... ।'

স্পীকার মহাশয়, যখন থেকে 'ইন্ডিয়ার এক্সপ্রেস'এ অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের বাংলাদেশে গণহত্যা প্রতিবেদন ছাপিয়েছে, একটি অদ্ভুত অস্থিরতায় সারাদেশ ছেয়ে গেছে। আমি অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে ধন্যবাদ জানাই।... মাসকারেনহাসের মূল বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের দু'টি বিকল্প রয়েছে : ১. গণহত্যা, ২. উপনিবেশিকরণ '। (বা.স্বা.যু.দলিলপত্র, খ.১২ পৃ- ৮২৪)।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে গণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ অপরাহ্নে জনপ্রতিনিধিদের প্রণীত স্বাধীনতা ঘোষণা মতে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও জনাব তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী মর্মে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল মুক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার (মুজিব নগর) আম বাগানে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি দ্বারা প্রণীত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিব নগর এবং মুজিব নগরকে অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ১৭ এপ্রিল সরকার গঠন করার পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ 'বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবারগোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।'

একাত্তরের মে মাস থেকে বাংলাদেশ হতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে ভারতে আগত বাঙালি রিফিউজিরা শরণার্থী হিসাবে অভিহিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই বক্তব্য প্রদানের পর 'রিফিউজি' ক্যাম্পগুলো "শরণার্থী ক্যাম্প" হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে 'শরণার্থীরা' 'জয়

বাংলা'বাসী হিসেবেও পরিচিত হয়। ২৪ মে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, '১৫ ও ১৬ মে আমি আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ সফর করে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের লোকসভার পক্ষে সমবেদনা ও সমর্থন জানিয়েছি। আমি বিস্মিত হয়েছি, এত অল্প সময়ে এত বড় সংখ্যা শরণার্থীর আগমন ইতিহাসে বিরল। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রকৃত অবস্থা সুনিশ্চিত করতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি এগিয়ে না আসে কিংবা ব্যর্থ হয়, তবে ভারত যেকোনো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।'

২৫ জুন লোকসভায় প্রদত্ত বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বলেন ঃ আমি ৬ থেকে ২২ জুন মস্কো, বন, প্যারিস, অটোয়া, নিউইর্য়ক, ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে সফর করে সেসব দেশের সরকারপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়কালে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করেছি।

৯ আগস্ট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দিল্লির এক জনসমাবেশে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) শরণার্থীরা যাঁরা এখানে এসেছে তারা এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসেনি। তারা আক্রান্ত, বিপন্ন। বিশ্বের কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত এত বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর দায় নেয়নি। ভারতেরও সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভারত তার মানবিক দায়িত্ব ও দায় থেকে চ্যুত হতে পারে না বা কারো ভয়ে ভীত হয়ে সে দায়িত্ব পালনে বিরত হবে না।'

ভারতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক শরণার্থী যাতে দ্রুত দেশে ফিরে যেতে পারে সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের উদ্দেশে ভারত সরকার এপ্রিল-মে থেকেই চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রথমাবস্থায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী একটি দেশ বিরুদ্ধাচরণ করাতে সেই ভারতীয় প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি। অন্যদিকে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বন্ধু হওয়ায় ধনিক পশ্চিমা বিশ্ব তাৎক্ষণিকভাবে সেদিন এগিয়ে না আসলেও ওইসব দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, মুক্তি ও শান্তিকামী সাধারণ মানুষ শরণার্থীদের সাহায্যার্থে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। ভারত সরকারের যখন এমন দুর্দিন, পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলো যখন প্রতিনিয়ত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রকাশ্য অভিযোগ করছে, ওই রকম অবস্থাতে শ্রীমতী ইন্দিরা সাহস হারান নি।

আমি সরকারি সফরে পশ্চিম বাংলার শরণার্থীদের সাথে বিভিন্ন শিবিরে কথা বলেছি। তাদের কথায় শুধু পাকবাহনী ও রাজাকারদেও মানবতারিরোধী গণহত্যা ও নির্যাতন জনিত প্রাণভয়ের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। তাদের অনেকে বলেছে : যারা আমাদের প্রতিবেশী, তারা শান্তি কমিটির সদস্য হলো, আবার রাজাকার হয়ে আমাদের সাথে এতবড় বেঈমানি করলো, আমাদের ঘরদোড় ভেঙ্গে নিয়ে গেল, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। আর্মি দিয়ে গুলি করে মারলো, মা-বোনদের ধরে নিয়ে ইজ্জত নিয়ে

নারকীয় উল্লাস করলো, তাদের সাথে থাকা যাবে না। আমাগো ব্যবস্থা করে দেন আমরা আর ফিরে যাবো না, কে আমাদের বাঁচাবে? কে আমাদের নিরাপত্তা দেবে? কে আমাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে? আমাদের সব গেছে– মান-সম্মান-সম্পদ-জীবন সব হারিয়েছি। আমরা এখন লেংটি পরা উদ্বাস্তু। সারাদিন রেশনের চালের জন্য ক্যাম্পে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । আমরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছি বলে, আর আমরা হিন্দু বলে সব হারিয়ে অত্যাচারিত হয়ে বাস্তুহারা হয়েছি। আপনি চাকরি করেন তাই এসব কথা কইছেন, বুকে হাত দিয়ে কনতো আমাগো এহন কী করা উচিত।

আমি বললাম, দেশ স্বাধীন হলে আর কোনো ভয় থাকবে না, আবার সম্মানসহ স্বাধীন দেশের নাগরিক হবেন। পাকিস্তানি নির্যাতন থাকবে না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে আমরা বাস করবো। বিরাট কিছু পেতে জাতিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলেই পাকসেনাদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত। পাকিস্তানি আমলের সব কালা আইন বাতিল হয়ে যাবে, পূর্বপুরুষের সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাবেন। আমরা সকলেই স্বাধীন দেশের সম নাগরিক হবো, চাকরি-বাকরি,ব্যবসা-বাণিজ্যে সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবো। নিজের মাটিতে পূর্বপুরুষের ভিটায় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে বাঁচবো। আজ এই যে আমরা শরণার্থী হয়ে এসে হাজার হাজার লোক অসুখ-বিসুখে মরলো , লক্ষ লক্ষ শিশু ও প্রসূতি অপুষ্টি , অনাহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মারা গেল তাদের মৃত্যু কী কোনো মূল্য পাবে না ? আমরা সকলে দেশে নিজ ভিটায় ফিরে যাবোই, স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হবোই। আমার কথায় অনেকে চুপ করে থাকে, তাদের অনেকেই খুলনা 'চুক নগরের' বা অন্য কোনো এলাকার গণহত্যার নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে। সর্বস্ব হারিয়ে জীবন নিয়ে বেঁচে এসেছে। আমি বুঝলাম, প্রাণের ভয় নিদারুণ, স্বজন হারানো অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীদের প্রতি আস্থাহীনতা তাদের মন বিক্ষিপ্ত। এই মানবেতর শরণার্থী জীবন তাদের কাছে কোনো পথের সন্ধান বা নতুন আশার আলো বয়ে আনেনি? তবু বৃদ্ধদের মধ্যে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়, বাপ-ঠাকুরদা ভিটায় ফিরে যাবো, দেশে যাব। আগে বাংলাদশ স্বাধীন হোক।

একাত্তরের জুন মাস থেকেই ভারতীয় সেনা প্রশিক্ষকদের অধীনে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা বাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পরাশক্তির আসল দৃষ্টি ভঙ্গি কী তা সরেজমিনে জানার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সফর করেন। ভারত শুরু থেকেই ১ কোটি শরণার্থীদের (শরণার্থীর ২০ শতাংশ মুসলিম ছিল) বোঝা বেশিদিন সামলানো অসম্ভব হবে–এ পটভূমিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতের নীতি পরিবর্তন হতে থাকে। ৯ আগস্ট '৭১ স্বাক্ষরিত ২০ বছরের ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি। চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জন্য বিশেষ বার্তাবহ ছিল।

ডিসেম্বর ৩ তারিখে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে চীন প্রকাশ্যে জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে এবং সোভিয়েতের যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের

জন্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে চীন ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তীব্র সমালোচনা করে বলে ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং চীন সরকারের প্রকাশ্যে এবং গোপনে পাকিস্তান সরকারের এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে আরো নির্মম করে তুলেছিল। ভারত ও সোভিয়েতের ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করে। ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ দেয়–সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত করে তোলে।

জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিন্ডিকে বলেছিলেন : সকাল ন'টার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা। একটা বেতার ফ্রিকোয়েনসিও বলে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, নিয়াজি সেদিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসেরও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনো ফলই হলো না। ইয়াহিয়া খানকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ বাড়ছে এবং পাকবাহিনীতে ত্রাসও বাড়ছে। ঢাকার বেসামরিক পাকিস্তানিরাও আত্মসমর্পণের পক্ষে চাপ বাড়াচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটা বিদেশি দূতাবাসও।

১৬ ডিসেম্বর : সকালে নিয়াজি আবার কয়েকজন বিদেশি দূতের সাথে কথা বললো এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করলো যে মানেকশ'র প্রস্তাবই মেনে নেবে। তখন শুরু হলো ওই ফ্রিকোয়েনসিতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বিদেশির সাথে বসে নিয়াজি বারবার সেই চেষ্টা করতে থাকলো। সকাল প্রায় সোয়া আটটা থেকে। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারলো না। ন'টা যখন বাজে বাজে তখন গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন খুলে কান পেতে বসে রয়েছে। তারাও ভীষণ ভীত। তারাও বুঝতে পারছিলেন, ঢাকার লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাঁদেরও অনেকের প্রাণ যাবে। তারাও তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজি মানেকশ'র প্রস্তাবে রাজি হয় কিনা। কিন্তু হায়, ন'টার সংবাদে তারা আকাশবাণীর বাংলা খবরে জানতে পারলেন, নিয়াজি কোনোও জবাবই দেয়নি! বিমান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে!

ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়েও দিয়েছে যে তার বাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে। তখনই ঠিক হলো, বেলা বারোটা নাগাদ মিত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন নিয়াজির সাথে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে। ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের ওপর নাগরার বাহিনী আটকে পড়েছিল। টঙ্গির কাছাকাছি। নদীর ওপরের ব্রিজটা পাকিস্তানিরা ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১৬ তারিখ ভোরে নাগরার বাহিনী নয়ারহাট ফরেস্ট রোড দিয়ে সাভারের কাছাকাছি এসে ঢাকা-আরিচাঘাট রোডের ওপর পড়লো। পাকবাহিনী এই রাস্তায়

ভারতীয় বাহিনীকে আশাই করেনি। তাই ওদিকে কোনোও প্রতিরোধের ব্যবস্থাই রাখেনি। এমনকি ব্রিজগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গেনি। আরিচাঘাট রোডে পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগোলো। মাত্র কয়েক মাইল। প্রথমেই মীরপুর।

পাকবাহিনীর জেনারেল জামসেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করলো। নাগরার বাহিনী ঢাকা ঢোকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হলো। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হলো। বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪-২১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্সে জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলো।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীর কাছে ততক্ষণে আত্মসমর্পণের নির্দেশ চলে গিয়েছে। সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্টগ্রাম এবং খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওইদিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল। মধুমতি নদীর পূর্ব তীরে। চট্টগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে পড়েছে। আর খুলনায় পাকবাহিনীর একটা অংশ তখন খালিশপুরের অবাঙ্গালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চালাচ্ছে। নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।"*

পৃথিবীর মানচিত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই মহান বিজয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, কেননা এদেশ জনযুদ্ধের ফসল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice)। অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্মোষিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা, পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, প্রস্ফুটিত হবে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ।

মুজিব নগর থেকে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও সচিবালয় স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ২২ ডিসেম্বর '৭১ তারিখে। পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে প্রায় ত্রিশ লাখ বাঙালিকে। হত্যা করে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের। এক কোটি বাঙালি শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিবেশী ভারতে। লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থক সহ সংখ্যালঘুদের ওপর অমানষিক অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীদের সতীত্ব হারাতে হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্য দিল্লী হয়ে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে লেখা হলো মুক্ত বাংলার স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস। পূর্ণ হলো বাঙালি জাতির

---

* 'বাংলা নামে দেশ'– অভীক সরকার সম্পাদিত কলকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৯৮-১৩৯

স্বাধীনতা স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ভাষ্যমতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিয়ে পূর্ণ হলো বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন।

একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাড়ে সাত কোটি স্বাধীনতাকামী বাঙালির হৃদয়ে, শরণার্থীর জীবন-সংগ্রামে ও লক্ষ নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুই একাই ছিলেন আকাঙ্খিত বাংলাদেশের প্রতীক। ওই পাকবাহিনী ও দোশরদের 'অপারেশন সার্চ লাইটের' অন্ধকারের দিনগুলিতে, ওই গণহত্যার দিনগুলিতে, ওই অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলিতে, এক কোটি বাঙালি শরণার্থী ও লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা, যারা ভবিষ্যতের জাতিকে সৃষ্টি করবে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি আনবে, তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন একমাত্র প্রেরণা, সান্ত্বনা ও বিপ্লবের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতি আর তার নিজের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য আত্মীক-সেতু গড়ে তুলেছিলেন। এটা কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না,এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধারাবাহিক সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বিশ্বস্ত পরিণতি। মুক্তিযুদ্ধকালে দুই অসম শক্তি ও জাতিসংঘের বিতর্কে বাংলাদেশকে নিয়ে এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত হলেন। তা হলো বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' এক আদর্শ জনযুদ্ধ ও গৌরবের প্রতীক। এই প্রতীকেই মূর্ত হয়ে থাকবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

উল্লেখ্য, আমি ১৯৬৬ সালে এপ্রিল মাসে ফরিদপুর সিটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমাদের নেতৃত্বে ফরিদপুরে ব্যাপকভাবে ৬-দফা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিলাম। ১৯৭০ সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনমত সৃষ্টি করেছি। বঙ্গবন্ধুর আদেশেই মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিকপাদে সাংগঠনিক ও বিশেষ প্রতিরোধ গড়ার দায়িত্ব পালন করেছি। জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামকে ফরিদপুর থেকে ৩১ মার্চ '৭১ নিরাপদে মুজিবনগর পৌঁছানো ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলাম। ফরিদপুরে যুদ্ধবিষয়ক আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ও কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি ফরিদপুর থেকে জনাব আব্দুর রব সেরনিয়ামত এমএনএ, ফণী ভূষণ মজুমদার এমপি এবং ভোলাবাসী এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে কলকাতায় পৌঁছি। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ ও ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তানি উপ-দূতাবাস প্রধান হোসেন আলীর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম বাংলাদেশ মিশন ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ২২ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ফরিদপুর দখল করার ফলে তাদের ফেরার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ এপ্রিল মাসে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় একজন সংগঠক–মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধকালে সাহায্য, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান মহোদয়ের জনসংযোগ, শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে সাহায্য, পুনর্বাসন

ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন ও ভারত সরকার থেকে যশোর জেলা প্রশাসনে রিলিফ, যানবাহন, সরবরাহ ও শরণার্থী প্রত্যাবাসনে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছি ।

১৯৮৫ সালে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঢাকা ভ্রমণের মাঝে তার সাথে মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্সের স্বত্ত্বাধিকারী গোলাম মোস্তফার সৌজন্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অ্যান্থনি তখন তাঁর দ্বিতীয় বই "দি লেগাসি অব ব্লাড" বইয়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। পরে মেসার্স হাক্কানীর মালিক গোলাম মোস্তফা দুটো বইয়ের অনুবাদের সত্ত্ব অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করেন। "দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ" বইটি অনুবাদ করেছিলাম ২৫ বছর আগে। উদ্দেশ্য ছিল প্রজন্মের কাছে সহজ সরল বাংলায় স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরার। 'হাক্কানী পাবলিশার্স'এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'পপুলার পাবলিশার্স' থেকে ১৯৮৯ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে উত্থাপিত সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাসের যুক্তির সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন তবুও ঐ সময়ের মাপকাঠিতে তাঁর সাহসিকতা ও গণহত্যা সম্বন্ধে অকপট প্রতিবেদন যা সাড়া বিশ্বে টনক নড়িয়ে দিয়েছিল এবং এটা ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের কালের বিশ্লেষণ করে পূর্ব বাংলায় ১৯৭১ সালের বিয়োগান্ত জটিল পরিস্থিতি এক বাক্যে সার-সংক্ষেপ করে দেখিয়েছেন যে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের পতাকার তলে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এটি হলো প্রথম বই। লেখক সাংবাদিক এই বইয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে সামরিক অভিযান জনিত হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ ও 'হিন্দু গণহত্যা'র মতো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরেছেন। সে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের পাকিস্তানি পাঞ্জাবী-সামরিক, আমলাচক্রের নেপথ্যচারিতা, নিস্পেষণ, শোষণ ও সর্বোপরি পাকিস্তানি পাঞ্জাবী সামরিকচক্রের রাজনৈতিক ব্যাভিচারকেই তিনি 'রেইপ' শব্দ দিয়ে অর্থবহ করে তুলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভৎস মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের ওপর রচিত "দ্যা রেইপ অব ফ্রান্স" বইয়ের নামকরণের অনুসরণে "দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ" বইয়ের নামকরণ করে থাকবেন।

পরিশিষ্ট-১

পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল বা যৌথ রাষ্ট্র এবং ছয় দফা ফর্মূলার ভিত্তিতে এই ফেডারেশনের বা যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

প্রথম দফা

সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে ফেডারেল বা যৌথ রাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির; তাতে যৌথ রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হতে হবে।

দ্বিতীয় দফা

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফায় ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়।

তৃতীয় দফা

পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে। এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে।

চতুর্থ দফা

রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান দেয়া হবে। সংবিধানে নির্দেশিত বিধানের বলে রাজস্বের এই নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হয়ে যাবে। এহেন সাংবিধানিক বিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্বনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকে।

পঞ্চম দফা

যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসেব রাখতে পারে, সংবিধানে সেরূপ বিধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে, সংবিধান নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে তা আদায় করা হবে। সংবিধানের বিধানানুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে, যার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতে থাকতে হবে।

ষষ্ঠ দফা

ফলপ্রসূভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে মিলিশিয়া কিংবা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-২

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় প্রদত্ত 'আমাদের বাঁচার অধিকার', 'ছয় দফা ফর্মূলা' শীর্ষক ভাষণের উপসংহারে 'আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের' প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবেদন ঃ

আমি আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলতে চাই ঃ

প্রথমত, তাঁদের এই ধারণা করা উচিত হবে না যে, আমি (ছয় দফায়) যা বলেছি তা কেবল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার্থেই বলেছি। এ কথা ঠিক নয়। আমার ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিটি দফা থেকে আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভায়েরাও স্বাভাবিকভাবে অনুরূপ লাভবান হবেন। এই দফাগুলো কার্যকর হলে তারা অবশ্যই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

দ্বিতীয়ত, যখন আমি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা বলি, তখন তদ্দারা আমি কেবল আঞ্চলিক কেন্দ্রীভূতকরণের কথাকেই বুঝাই। তদ্দারা আমি একথা বলতে চাই না যে, এই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের হাতে পৌঁছেছে। না, তা নয়। আমি তা বলতে চাই না বা বলতে পারি না। আমি জানি, পশ্চিম পাকিস্তানে এমন লাখ লাখ লোক রয়েছে, যারা আমাদের মতই আর্থিক শোষণের হতভাগ্য শিকারে পরিণত হয়েছে। আমি একথাও জানি যে, দেশের যাবতীয় সম্পদ গুটিকয়েক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। পুঁজিবাদী ছাঁচে গড়া আমাদের সমাজ, এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে। কিন্তু তার আগে অবশ্যই আঞ্চলিক শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। আমি কিন্তু এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে দায়ী করছি না।

তৃতীয়ত, এই অবিচারের জন্য দায়ী দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অস্বাভাবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার পরিণাম দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হতো তাহলে এই আঞ্চলিক শোষণ উল্টোভাবে ঘটতো। আমাদের রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ যা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ব্যয় হচ্ছে। এবং রাজস্বের শতকরা ৩২ ভাগ, যা কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ব্যয় হচ্ছে, তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো। 'সরকারের ব্যয় হলো জনগণের আয় এবং সরকারের আয় হলো জনগণের ব্যয়'–জাতীয় অর্থ সম্পর্কে এই সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যটি পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় প্রযোজ্য হতো। আমাদের মোট রাজস্বের এই ৯৪ শতাংশ, যা প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে এবং এভাবে পশ্চিম

পাকিস্তানের মূলধন গঠিত হচ্ছে, তা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পদশালী করে তুলত। সরকারের কর্মকেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি প্রধান কার্যালয় এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি মিশনের দপ্তর স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং সেগুলোর যাবতীয় খরচ সেই অঞ্চলেই হচ্ছে। সরকারের কর্মকেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে থাকলে এ সমস্ত ব্যয় এখানেই হতো। তাহলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পদশালী হতো এবং সেই অনুপাতে পশ্চিম পাকিস্তান দরিদ্র থেকে যেত।

এমতাবস্থায় আপনারা, পশ্চিম পাকিস্তানিরা আঞ্চলিক ন্যায়বিচারে জন্য আমাদের মতই দাবি তুলতেন, যার জন্য আপনারা আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানিদের অসৎ অভিপ্রায়ের দোষ দিয়ে নিন্দা করছেন। অবস্থা এরূপ হলে আপনারা উপলব্ধি করতে পারতেন যে, আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। সেই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যদি আঞ্চলিক ন্যায়বিচারের দাবি তুলতেন তাহলে আপনারা কী জানেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতো? আমরা তৎক্ষণাৎ সত্য বলে স্বীকার করে নিতাম যে, ন্যায়বিচার ও সমতা দাবি করার অধিকার আপনাদের আছে এবং তা করা আপনাদের কর্তব্য।

কেবল তাই নয়, আমরা আরো অগ্রসর হতাম। এ সমস্ত দাবি আপনাদের উত্থাপন করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতাম না। তার পরিবর্তে আপনাদের দাবি উত্থাপন করার আগেই আমরা আপনাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতাম। সত্যই আমরা ন্যায়বিচার, সমতা এবং ন্যায্য ব্যবহারে বিশ্বাস করি। একটি রাষ্ট্র একটি বৃহৎ পরিবার ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি একটি পরিবারের মধ্যে কোনো একজন আহার করলেই অন্যের পেট ভরে না। কাজেই আমাদের ন্যায্য অংশের দাবি তুললেই কী করে এবং কোন বিবেকের বলে আপনারা আমাদের স্বার্থপর বলে অভিহিত করেন? আর আপনারা যখন কেবল নিজেদের অংশই ভোগ করছেন না, আপনাদের ভাইদের অংশও গ্রাস করছেন, তখন অন্যেরা আপনাদের কী বলে অভিহিত করবে? যাহোক, আমরা কেবল আমাদের নিজেদের অংশই দাবি করছি, আপনাদের অংশ নয়। আমরা আপনাদের সঙ্গে সমান অংশীদার হিসেবে বাস করতে চাই, শোষক হিসেবে নয়।

চতুর্থত, আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাই, তাহলে আমাদের অংশ থেকে আপনাদের জন্য কিছু ছেড়ে দিতেও পারি। অতীতে আমরা সেরূপ দিয়েছিও। আপনাদের কি তা, স্মরণ নেই? দয়া করে স্মরণ করে দেখুন ঃ

১। প্রথম গণপরিষদে আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪৪ এবং আপনাদের সংখ্যা ছিল ২৮। যদি আমরা ইচ্ছে করতাম, তাহলে গণতান্ত্রিক উপায়েই কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কার্যালয় পূবর্ক পাকিস্তানে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি।

২। প্রকৃত ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতি এবং সমতাবোধের দরুন আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের ভোটে ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানিকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করে দিয়েছি।

৩। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে আমরা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছি এবং তা গ্রহণ করেছি।

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারতাম।

৫। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাব্য জটিলতা দূর করার জন্য আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বলি দিয়েছি এবং সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করেছি। আপনাদের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে যে, আপনারা সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে চলবেন।

পঞ্চমত, পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের মনে এই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য উপরোক্ত কথাগুলোই যথেষ্ট যে আমরা, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা প্রকৃতই ভ্রাতৃসুলভ সমতাবোধ নিয়ে আপনাদের প্রতি আচরণ করতে আগ্রহী, তদ্বারা আমরা সম্মান ও গৌরবের মধ্যে বাস করতে চাই। অতীতেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনাদের প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে। পূর্ব পাকিস্তানে যদি রাজধানী স্থাপিত হতো, তাহলে আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি সত্যিকারের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করতাম এবং এই রাজধানী কেবল তামাশার বস্তু হতো না। আমরা কখনো সেই সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতাম না এবং জোর করে কখনো সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিস আমাদের অধিকারে রাখতাম না। আমরা তুলা বোর্ড, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, রেলওয়ে বোর্ড, পোর্ট ট্রাস্ট, ওয়াপদা (পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা) ইত্যাদি সংস্থার চেয়ারম্যানের পদের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের যাবতীয় উচ্চ ও লাভজনক পদ অধিকার করতাম না।

আমরা আপনাদের অঞ্চলের গভর্নরের পদ অধিকার করার কথাও চিন্তা করতাম না। তার পরিবর্তে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ব্যয়ের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। আমরা আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সঙ্কুচিত করার পরিবর্তে প্রসারিত করতাম। আমরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি হতে কখনো দিতাম না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা সংখ্যাগুরু, সরকারের কার্যালয় আমাদের এখানে, কাজেই আমরা পাকিস্তানের প্রভু-এ জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হওয়ার মতো কোনো কাজই আমরা কখনো করতাম না। তারচেয়ে বরং আমরা প্রতিটি কাজ এমনভাবে করতাম যাতে আপনারা বুঝতে সক্ষম হতেন যে, এই দেশ চিন্তা ও কর্মে উভয় দিক দিয়ে আপনাদের এবং আমাদের। আমরা আপনাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমানভাবে ভাগ করে নিতাম।

আমরা বিশ্বাস করি যে, অবিমিশ্র সমতার এই অনুভূতি, আন্তঃপ্রাদেশিক ন্যায়বিচারের এই চেতনা এবং পক্ষপাতশূন্যতা হলো পাকিস্তানি দেশাত্মবোধের ভিত্তি। একমাত্র তিনিই পাকিস্তানের নেতা হওয়ার যোগ্য, যিনি এহেন দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসর্গীকৃত। যে নেতা আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের দু'টি শাখা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দেহের দু'টি চোখ, দু'টি কান, দু'টি নাসারন্ধ্র, দুই সারি দাঁত, দু'টি হাত এবং দু'টি পা; যে নেতা অনুভব করেন যে পাকিস্তানকে সুস্থ ও শক্তিশালী করতে হলে এর উভয় অংশকে সমানভাবে সুস্থ ও শক্তিশালী করতে হবে; যে নেতা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের অঙ্গ দু'টির যেকোনো একটিকে দুর্বল করলে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকেই দুর্বল করা হয়; যে নেতা অতি আগ্রহের সঙ্গে এই মত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক পাকিস্তানের যেকোনো অঙ্গকে দুর্বল করে, সে দেশের শত্রু; এবং যে নেতা এ ধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে নেতাই পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বের দাবি করতে পারেন। পাকিস্তান একটি মহান দেশ, যার দিগন্তপ্রসারী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে। যিনি এর যোগ্য নেতা হতে চান, তাঁকে অবশ্যই দিগন্তপ্রসারী অসাধারণ দৃষ্টিসহ মহান হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

ষষ্ঠত, আমি বিনীতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই ও বোনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার জন্য দাবি করেছিলাম, তখন আপনারা এটাকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আন্দোলন বলে দোষারোপ করলেন। পুনশ্চ বিশেষ করে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের বেলায় আপনাদের সংখ্যাসাম্য নীতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন যুক্তনির্বাচন দাবি করেছিলাম, তখনও আপনারা এই মর্মে আমাদের নিন্দা করেছিলেন যে, আমরা সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এ দু'টি দাবিই এখন স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু সেগুলো স্বীকৃত হওয়ার পর পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যায়নি। এতে কী আপনাদের লজ্জা হয় না যে, অনিচ্ছুক বিদেশি শাসকদের কাছ থেকে বলপূর্বক কিছু সুবিধা আদায় করে নেয়ার মতো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবি আপনাদের কাছ থেকে চরম মূল্য দিয়েও দুঃখজনক সংগ্রাম করে আদায় করতে হবে? এতে কি আপনাদের মর্যাদা বাড়ে? দয়া করে এ ধরনের মনোভাব চিরদিনের জন্য পরিহার করুন। দয়া করে আপনারা আমাদের শাসক না হয়ে নিজেদেরকে আমাদের ভাই হিসেবে মনে করুন। আমি যে ফর্মূলা তুলে ধরেছি তা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন করছি। তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে, আমার ছয় দফা কর্মসূচির কোনো দফাই অন্যায়, অবাস্তব কিংবা দেশের সংহতি বিনাশকারী নয়। আমি আশা করি, আমি সাফল্যের সঙ্গে এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে একথা বুঝাতে পেরেছি যে, এই দফাগুলো স্বীকৃত হলে পাকিস্তান কিছুতেই দুর্বল হবে না, বরং তা আরো অধিক শক্তিশালী হবে।

কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদী মহল সুস্পষ্ট কারণেই আমার ছয় দফা স্বীকার করবে না। তারা তাদের নিজস্ব পথে সবকিছুর বিচার করে থাকে। তাদের কাছে কেবল অবিরাম ও চিরস্থায়ীভাবে শোষণের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। এই শোষণের কাজে যিনি ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন কিংবা ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য হুমকি দেবেন, তাদের কাছে তিনি দেশদ্রোহী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রতীয়মান হবেন। এটা কোনো নতুন কিংবা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। জনাব ফজলুল হক ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত আমাদের পূর্ববর্তী মহান নেতৃবৃন্দ এ ধরনের কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের শিকার হয়েছিলেন। শোষিত জনগণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে যিনি এগিয়ে আসবেন, তাঁকে এ ধরনের নিন্দাবাদ ও কারাবরণের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। অতীতে আমার ভাগ্যে এ ধরনের বহু বিচার ও দুর্দশা জুটেছে। আমার মুরব্বিদের দোয়া, আমার সহকর্মীদের সাহচর্য এবং আমার দেশবাসীর প্রীতিপূর্ণ সমর্থনের জন্য অসীম করুণাময় আল্লাহ্‌ আমাকে ঐ সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করার মতো যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য দিয়েছেন। আমার দেশবাসীর এই সীমাহীন প্রীতি নিয়ে, যা আমার কাছে মূল্যবান সম্পদ, আমি তাঁদের সেবায় যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমার দেশের অগণিত লোকের মুক্তির তুলনায় আমার মতো একজন লোকের জীবন কিছুই নয়।

আমি জানি লাখ লাখ শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চেয়ে আর কোনো মহত্তর সংগ্রাম থাকতে পারে না। আমার রাজনৈতিক গুরু জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছ থেকে আমি তা শিখেছি। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়ার জন্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমি তাঁর এই উপদেশকে আজীবন অনুসরণ করতে এবং তাঁর আদর্শের পতাকাকে উড্ডীয়মান রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশ এখন তার সবচেয়ে সঙ্কটময় কালের মধ্য দিয়ে চলছে। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল এর সভাপতিত্বের গুরুদায়িত্ব অতিরিক্ত বোঝার মতো আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমি কর্তব্যপরান্মুখ নই। আমি কাজকে ভয় করি না। কাজেই আমি বিনয়ের সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার লোকদের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমি একথাও জানি যে, রাতের গাঢ়তম আঁধারের মুহূর্তটি ঊষার আগমনের ইঙ্গিত দেয় মাত্র। আমার প্রিয় দেশবাসী, আল্লাহর নিকট এই দোয়া করবেন যেন তিনি আমাকে সবসময় মানসিক শক্তি ও দৈহিক যোগ্যতা দান করেন, যাতে আমি তাঁদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমার বাকী জীবন উৎসর্গ করতে পারি, যে অধিকার তাঁদের কাছ থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৩

পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা দাবি ঃ

১। ক) প্রাদেশিককৃত কলেজগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

খ) স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) প্রাদেশিক কলেজগুলোকে নৈশ ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ছাত্র-বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে।

ঙ) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং সমস্ত অফিসের কাজে বাংলা ভাষাকে চালু করতে হবে।

চ) ছাত্রাবাসের ব্যয়ভারের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারকে বহন করতে হবে।

ছ) শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে হবে।

ঞ) পলিটেকনিক ছাত্রদের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

ট) হ্রাসকৃত ভাড়ায় রেল ও বাস ভ্রমণের সুযোগ দিতে হবে।

ঠ) চাকুরির সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ড) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

ঢ) জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও হামিদুর রহমান রিপোর্ট বাতিল করতে হবে।

২। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করতে হবে।

৩। ক) যৌথ রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার চালু করতে হবে এবং তাতে ব্যবস্থাপক সভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।

খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে নিয়ে একটি উপ-যৌথরাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও বৃহৎ শিল্পগুলো জাতীয়করণ করতে হবে।

৬। কৃষকদের ওপর ধার্যকৃত যাবতীয় কর ও রাজস্বের হার কমাতে হবে।

৭। শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও বোনাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। যাবতীয় জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নিবারক আদেশ তুলে নিতে হবে।

১০। সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।

১১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীসহ বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশ সরকার সংকলিত বাঙালিদের সংগ্রামের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি ঃ

১৯৪৭ জুন, ২০ বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ৫৬-২১ ভোটে প্রদেশটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আগস্ট, ২৫ বন্যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

১৯৪৮ মার্চ, ১১ রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনার দায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

আগস্ট, ১৪ পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৫০ অক্টোবর, ৬ আজিজুল হক খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবিত যৌথ রাষ্ট্রের আড়ালে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করছেন।

নভেম্বর, ২৪ মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলের ১৩ জন সদস্য একটি যুক্তবিবৃতি প্রচার করেন এবং তাতে পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন।

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী, ২১ মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়া এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের গুলিতে ১৯ জন ছাত্র এবং আরো অনেকে নিহত হন।

১৯৫৪ মার্চ, ১৫ প্রাদেশিক আইন পরিষদের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি করা হয়।

মার্চ, ১৯ আওয়ামী লীগের এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী এবং কৃষক-শ্রমিক দলের এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

মে, ১৭ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গোলমালকে 'বিদেশি ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেন।

মে, ১৯ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। গভর্নরের শাসন জারি করা হয় এবং ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয়।

আগস্ট, ৪ পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব বন্যার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। তাতে লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৫৮ জুন, ২৪ পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০ প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকারকে মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ বলে ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

অক্টোবর, ৭ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

অক্টোবর, ১২ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী এবং খান আব্দুল গফ্‌ফার খানকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৯ মে, ৮ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মনসুর আলীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০ সেপ্টেম্বর, ১২ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ফৌজদারী অসদাচরণের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং দু'বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

অক্টোবর, ১০ পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের ফলে তিন হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

অক্টোবর, ৩১, আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বিশ হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

১৯৬১ মে, ৯ পূর্ব পাকিস্তান পুনরায় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। যার ফলে দু'হাজারেও অধিক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

সেপ্টেম্বর, ২১ ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী শ্লোগানরত বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২৪ সোহরাওয়ার্দি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন।

১৯৬২ এপ্রিল, পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলে। বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চারজন বাঙালি সদস্য পদত্যাগ করেন।

জুন, ৯ সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। 'মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা এর বিরোধিতা করে।

১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি ৫, মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ মার্চ, ২০ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

মার্চ, ২৭ মুজাফফরগড়ে চারজন বিরোধী মুসলিম লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

জুন, ৭ পূর্ব বাংলার সর্বত্র আইয়ুববিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের গুলিতে নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবির সমর্থনে ৭ জুনের আহূত সাধারণ ধর্মঘট ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হয়।

জুন, ১৭ আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী দল, কৃষক শ্রমিক দল এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালের খ্যাতনামা নাগরিকগণ পূর্ব বাংলায় একটি "ছায়া সরকার" গঠনের জন্য একটি ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।

১৯৬৭ ফেব্রুয়ারি, ২ পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্য একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

এপ্রিল, ২৭ 'অনিষ্টকর বক্তৃতা' দানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

ডিসেম্বর, ৩ আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (পিডিএম) গঠন করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৭ আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে শাহাবুদ্দিনের রিপোর্ট জাতীয় পরিষদে পেশ করা হয়।

১৯৬৮ জানুয়ারি, ৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

জানুয়ারি, ৬ পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার অপরাধে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসারসহ ২৮ জন লোককে গ্রেফতার করা হয়।

জানুয়ারি, ১৮ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জড়ানো হয়। ভারতের সাহায্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।

জুলাই, ১৮ পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয়। হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

ডিসেম্বর, ৭ ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে আইয়ুববিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের গুলিতে বহু লোক নিহত হয় এবং ৫০০ লোককে গ্রেফতার করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৪ চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু লোক নিহত হয়। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে উঠে এবং তাঁর পতনকে আসন্ন করে তোলে।

১৯৬৯ মার্চ, ২৫ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙ্গে দেন।

মার্চ, ২৬ ইয়াহিয়া খান ওয়াদা করেন যে, তিনি দেশে "সুস্থ পরিবেশ" এনে দেয়ার পর জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

মার্চ, ২৮ শেখ মুজিব একটি যৌথ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৯ জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মওলানা ভাসানীকে কাগমারীস্থ তাঁর গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়।

মার্চ, ৩০ মওলানা ভাসানী একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান।

এপ্রিল, ১০ ইয়াহিয়া খান প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন।

নভেম্বর ২৮ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর ধার্য করেন।

১৯৭০ জানুয়ারি, ১ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

এপ্রিল, ১ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেন।

সেপ্টেম্বর, ২ পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

ডিসেম্বর, ৭ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং জেড, এ ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি প্রধান দল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

ডিসেম্বর, ৯ শেখ মুজিব দাবি করেন যে, নতুন শাসনতন্ত্র তাঁর ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে, যাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়।

ডিসেম্বর, ১০ মওলানা ভাসানী স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করেন।

ডিসেম্বর, ১২ পূর্ব পাকিস্তানের আরো তিনটি দল এই স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে।

১৯৭১ জানুয়ারি, ১৪ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

জানুয়ারি, ২৯ ঢাকায় মুজিবুর রহমান ও জেড, এ ভুট্টোর মধ্যে যে শাসনতান্ত্রিক আলোচনা চলে, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তা পণ্ড হয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি, ১৩ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনের তারিখ ৩ মার্চ ধার্য করেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৫ ভুট্টো এই মর্মে হুমকি দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর মতামত গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করবেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৬ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পরিষদে দলের নেতা নির্বাচিত হন।

ফেব্রুয়ারি, ১৮ শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হবে না।

ফেব্রুয়ারি, ২১ ইয়াহিয়া খান তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন।

ফেব্রুয়ারি, ২৮ ভুট্টো জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মুলতবি রাখার দাবি জানান।

মার্চ, ১ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-অ্যাডমিরাল এস, এম, আহসানকে বরখাস্ত করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মুজিবুর রহমান ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেন।

মার্চ, ২ ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের কাজে নেমে পড়ে এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

মার্চ, ৩ আওয়ামী লীগ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের বৈঠকের প্রস্তাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্চ, ৫ আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কর্মব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ৩০০ লোক নিহত হয়।

মার্চ, ৬ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

মার্চ, ৭ শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে কর পরিশোধ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আদেশ নেয়ার জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করেন। ইস্ট বেঙ্গল রাইফেল্‌স বাহিনীর লোকেরা বাঙালি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে।

মার্চ, ৮ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

মার্চ, ৯ পূর্ব পাকিস্তানের বিচারপতিগণ লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে অস্বীকার করেন।

মার্চ, ১৪ কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ মার্চের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদেরকে কাজে যোগদানের জন্য চরম আদেশ জারি করে।

মার্চ, ১৫ শেখ মুজিবুর রহমান একপক্ষীয় স্বায়ত্তশাসন ঘোষণার কথা এবং পূর্ব বাংলার লোকদের প্রতি ৩৫টি নির্দেশ প্রচার করেন। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করেন।

মার্চ, ১৯ ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

মার্চ, ২১ ভুট্টো ঢাকায় আগমন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেন। শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটি অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন।

মার্চ, ২২ ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৫ আওয়ামী লীগ ইঙ্গিত দেয় যে, সেনাবাহিনীর হাতে আরো লোকের নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে বলে শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো সেনাদলের আগমন ঘটে। ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং অন্যান্য নেতা রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। গণহত্যা শুরু হয়।

অ্যান্থনী মাসকারেণহাস (১৯২৮-'৮৬) জন্মসূত্রে ভারতীয় গোয়ানীজ খৃস্টান, বসবাস সূত্রে পাকিস্তানী। করাচীতে সাংবাদিকতা পেশায় ১৯৪৭ সনে 'রয়টার'-এ যোগ দেন। পাকিস্তান সংবাদ সংস্থা, এপিপি এবং নিউইয়র্ক টাইমস, টাইম/লাইফ সাপ্তাহিকীর ১৯৪৯-'৫৪ পর্যন্ত সংবাদদাতা ছিলেন। করাচীসহ "দি মর্নিং নিউজ"এর চীপ রিপোর্টার, পরে সহ-সম্পাদক পদে ১৯৬১ সন থেকে ১৯৭১ সনের মে মাস পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। একাত্তরের এপ্রিল মাসে ঢাকা সফরকালে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং বিলেতে পালিয়ে গিয়ে 'সানডে টাইমস' (১৩ই জুন '৭১) পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে অগ্রণী ভূমিকাপালন করেন। তা'ছাড়া উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করে সাংবাদিকের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেন। 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' এবং বাংলাদেশ রক্তের ঋণ' গ্রন্থ দুটি সেই আলোকেই বিচার্য। ১৯৮৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর অ্যান্থনী মাসকারেণহাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।